দিল্লি অনেক দূর

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স,

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রচ্ছদপট—দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই টাকা

মাণিক ও মানসীকে

১ বৈশাখ, ১৩৫৮

মা

চুপ···চুপ! আগে ঘুরে ঘুরে দেখে এসো ভায়া, অচেনা কেউ আছে কিনা কোথাও। থাকলে ঘাড় ধরে বিদায় করে দিয়ে এসো—দয়া দেখাতে যেও না। গল্প বলব তারপর।

ভ্রূ কুঁচকে রয়েছ। ভাবছ, কি পাষাণ বুড়ো লোকটা—বাদলার মধ্যে দৈবাৎ কেউ এসে আশ্রয় নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়! সেকালে আমাদের হিরণ অবধি একদিন এমনি ভেবেছিল—তোমরা তো ভাববেই। আমাদের বরানগরের বাড়ির বারাণ্ডায় মাঘের রাত্রে এক ভিখারি আশ্রয় নিয়েছিল। আমি খুব তম্বি করছিলাম তার উপর। হিরণ মুরুব্বিয়ানা করে বলে, শুয়ে আছে তো কি হয়েছে! মেজাজ খারাপ কোরো না, চলে এসো—

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। লোকটাকে বলল, থাক্ রে বাপু, কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়্। সকালবেলা যাবার সময় কিছু হাতিয়ে যাস নে, এরা তা হলে আস্ত রাখবে না আমায়।

কিন্তু হিরণের কথায় আমার রাগ পড়ল না, হাত ছাড়িয়ে লোকটার উপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

কথা কানে যাচ্ছে না হারামজাদা উল্লুক? বললাম, ব্রাহ্মণ মানুষ—ভাত মারা যাবে এক চালের নিচে তুই পড়ে থাকলে—

এক হাতে ঘাড় আর এক হাতে দাড়ি ধরে হেঁচকা টান দিলাম। মুঠোর সঙ্গে দাড়ি উঠে এল। লোকটা কম্বল ফেলে দে ছুট। হো-হো করে হেসে উঠি তখন।

হিরণ বেকুব হয়ে গেছে। বলে, ব্যাপার কি ?

দুঃখের ব্যাপার—একটুখানি সুখেরও বটে। আস্তানা গুটাতে হবে—অনেক হাঙ্গামা, অনেক অসুবিধা। তবে সুখ এইটুকু যে, হারামজাদা ইত্যাদি চোখা-চোখা বিশেষণ সাধ মিটিয়ে বলে নিয়েছি।

প্রতিফল পেতে দেরি হল না। পরদিন প্রহর দেড়েক বেলায় ফুলপাড়-কোঁচা দুলিয়ে সিল্কের ছাতা মাথায় গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নূতন শ্বশুরবাড়ি যাবার ভঙ্গিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। জামরুলতলা অবধি এলে সাদা-পোষাক একজন এসে বলল, শুনুন—একবারটি আমার সঙ্গে যেতে হবে। পরিচয় জানতে চান ?

পরিচয় বুঝতে অবশ্য বাকি নেই, তবু আমি এটা-সেটা প্রশ্ন করছি, কোথায় যেতে হতে হবে ? গাড়ির ব্যবস্থা আছে, না পায়ে হাঁটতে হবে ?…মুখে বলছি এসব, আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—দৌড় দিয়ে পালাবার উপায় আছে কিনা ! সরু গলি আছেও একটা—তার পরেই মাঠ ও বস্তি। মুক্তির ঐ একমাত্র পথ। কিন্তু দু'টি ভদ্রলোক পান কিনছেন ঐ গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে—পান কিনলেন, সুপারি চেয়ে নিলেন, চুণ নিলেন বোঁটার আগায় করে, কিমাম আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। বায়রনের সোডা রাখে কিনা দোকানদার ?…অর্থাৎ সওদা চলবে এখনো বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

হেসে বললাম, আদর-আপ্যায়ন করে নিয়ে যাচ্ছেন তো গাড়িতে নিয়ে যেতে হবে মশায়। কুঁচকিতে ফোড়ার মতো হয়েছে, পা ফেলতে পারছি নে। ক-দিন ঘর থেকে বেরুতে পারি নি, আজকেই কেবল নিতান্ত দায়ে পড়ে এই বেরিয়েছি।

পা ফেলতে ইচ্ছে করছিল না সত্যিই। আগের দিন মাইল দশেক হেঁটে হেঁটে তবে এসে পৌচেছি, মেজাজ তাই অত রুক্ষ ছিল। দণ্ডিচ্যুত ভিখারি সঠিক সমস্ত খবর পৌছে দিয়েছে, অথবা—এই মহাপ্রভুটিই কালকের সেই ভিখারি কিনা কে বলবে ?

লোকটা বিষম সাবধান, এক পা নড়ে না, জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক

তাকায়, খালি গাড়ি যাচ্ছে কিনা কোন দিক দিয়ে। কিন্তু এখানে স্বল্প-পরিসর জনবিরল গলির মধ্যে সকালবেলা গাড়ি আসবে কোন কাজে ?

বড় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে নেবো—চলুন।

কয়েক পা গিয়ে, পারছি না—বলে এক রোয়াকে বসে পড়লাম। একটু খেলাচ্ছি। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে করতে হয় এ রকম, মনের দুশ্চিন্তার উপর একটুখানি আনন্দের রং বুলিয়ে নিই।

লোকটা বলে, বেশ তো টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটছিলেন মশায়, আমায় দেখে অচল হলেন। গাড়ি এদিকে নেই, কে এখন ডেকে আনতে যায় বলুন।

পানের দোকানের ঐ ওঁদের বলুন না।

বলে খিল-খিল করে হেসে উঠলাম।

ওঁরা ? ওঁদের কি দায় পড়েছে ? আপনার যেমন কথা !

তা হলে ওঁরাই এসে দাঁড়ান এখানে। আপনি যান।

এবার অত্যন্ত চটে গিয়ে লোকটি বলল, যাবেন না তা হলে ? বেশ ! খোদ রায় বাহাদুর ডেকে পাঠিয়েছেন, অন্য কেউ নয়।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিতান্ত রায় বাহাদুরের খাতিরেই যেন চলেছি। বন্ধ ছাতাটা লাঠির মতো ভর দিয়ে যাচ্ছি। যাচ্ছি আর ভাবছি, কোমরের মালটা কি ভাবে সরিয়ে দেওয়া যায়। চক্রব্যূহে ঘিরে ফেলেছে, বোঝা যাচ্ছে। ইনি এবং পানের দোকানের ঐ দু'টিই কেবল নয়—দেখতে পাচ্ছি না এমন বহু জন চারিদিকে রয়েছে। অলক্ষ্য পায়ে ঘিরে চলেছে তারা আমাকে। আমাদের এই পথের যারা পথিক, একটা বিচিত্র ক্ষমতা ক্রমশ জেগে ওঠে তাদের মধ্যে। কিছু না জেনেও পারিপার্শ্বিক বিপদ তারা বুঝতে পারে।

করুণার্দ্র হয়ে লোকটা বলল, তাই তো—বড্ড কষ্ট হচ্ছে যে আপনার !

ট্যাক্সি ডাকল। এর অর্থ জানি। বড় রাস্তায় এসে পড়েছি। গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়ে পাছে ডুব দিই—পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে ভরসা হচ্ছে না আর তাদের।

তেতলা লাল রঙের বাড়ি, চারিদিকে কাঁটা-তারের বেড়া। দরজার সামনে কনেস্টবল পাহারা দিচ্ছে।

বললাম, বাড়িতে নিয়ে এলেন—রায় বাহাদুরের আপিসে নয়?

কি দরকার? সামান্য কাজ—ক'টি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করবেন রায় বাহাদুর। আমাকে বললেন, আপনি নিজে চলে যান—যদি দয়া করে আসেন একটিবার।

ভিতরে ঢুকে, আমারই যেন কেনা গোলাম এমনি ভাবে সসম্ভ্রমে লোকটা বলল, সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে চলে যান স্যর। হরেন, এঁকে নিয়ে বসাও গে। আর রায় বাহাদুরকে একটা খবর দাও।

হরেন ছোকরাটিকে আমরাও জানতাম। রায় বাহাদুরের অনুগৃহীত, সেবা-যত্ন করে, রায় বাহাদুরের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে বেশি সময়। সরকারি কাজও করতে হয়—এই যেমন, রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে স্বভাবের শোভা দেখা, স্টেশনের প্লাটফর্মে মাঝে মাঝে যাত্রীদের উঠা-নামায় নজর রাখা। তবে এ সব কাজ থেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রায় বাহাদুর তাকে নিজের কাছাকাছি রাখেন। অফিসের কাজ যা করতে হয়, তার চেয়ে রায় বাহাদুরের নিজের কাজই বেশি।

উপরে উঠেই হলঘর—চমৎকার সাজানো। সামনে মস্ত বড় অয়েল-পেন্টিং—বড় বড় চুল-দাড়িওয়ালা এক সাধুসন্ত গোছের লোক। আরও দু-একবার আসতে হয়েছে তো এ বাড়ি—ছবিটা জানি, রায় বাহাদুরের গুরুদেবের। ছবির নিচে টিপয়ের উপর ধূপদান পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা। রায় বাহাদুরের অচলা নিষ্ঠা ঠাকুর-দেবতা আর এই গুরুদেবটির উপর। রাধাকৃষ্ণ, কালী, গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও পরমহংসের ছবি চারিদিককার দেয়ালে। শুনেছি, সন্ধ্যার পর অফিস-ফেরত রায় বাহাদুর আহ্নিক সেরে সকল ছবির সামনে দিয়ে নির্বিচারে ধূপদান ও পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেড়ান।

সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে হরেন যেন হুঙ্কার দিয়ে অভ্যর্থনা করে, বসুন—

বললাম, এক গ্লাস জল নিয়ে আসুন—তেষ্টা পেয়েছে।

হরেন ভিতরে চলে গেল। এইবার ফাঁক হয়েছে—এক মুহূর্ত। কোমরের রিভলভার—একবার ভাবলাম—সোফার নিচে ঠেলে রেখে দেবো, কিন্তু তা হলে খোয়া যাবে জিনিষটা। বড় কষ্টে সংগ্রহ করতে হয় এ সব, ছেলেখেলার বস্তু নয়, কত জনে এখনো জেল খাটছে এই সব সংগ্রহের ব্যাপারে। বুদ্ধি এসে গেল—রিভলভার ছাতার ভিতর ফেলে এক কোণে অবহেলার ভাবে রেখে দিলাম ছাতাটা। না, জল নিয়ে ফেরে নি এখনো হরেন। আপাতত নিশ্চিন্ত। আমায় এখানে নিয়ে এসেছে—তার মানে, জেরা করবে খানিকটা। আর রায় বাহাদুর সামনে আসার আগে খুব সম্ভব সার্চ করে দেখবে। বলা যায় না তো কার কি মতলব! ঐ সব লোক বড় সাবধান হয়ে চলাফেরা করে ইদানীং।

কিন্তু তা নয়। রায় বাহাদুর এলেন, কেউ সার্চ করল না। বেশ হাসি-মুখ দেখলাম রায় বাহাদুরের। বললেন, আহ্নিকে বসেছিলাম—আমার বড্ড দেরি লাগে, ধ্যানে বসে সমাহিত অবস্থা যতক্ষণ না আসে বসেই থাকতে হয়। কোন দিন তাড়াতাড়ি সে অবস্থা আসে, কোন দিন দেরিতে।

আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ—ভগবদ্ভক্ত মানুষ আপনি, খাঁটি মানুষ। আমরা সে কথা বলাবলি করে থাকি নিজেদের মধ্যে। নইলে এত প্রোমোশন কি করে হয় দেখতে দেখতে!

আমার তখন অবস্থা, খোশামোদ করে অল্পে অব্যাহতি পেলে হয়—ছাতা নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি। তাই একেবারে বেপরোয়া হয়ে প্রশংসা করছি। আর খোশামোদের একটা আশ্চর্য শক্তি দেখেছি—তীক্ষ্ণধী হলেও এ বিষয়ে মানুষ হঠাৎ কেমন নিরেট-বুদ্ধি হয়ে যায়, কাজ হাসিল করে নেবার জন্যই যে তাকে হাস্যকর বিশেষণে অভিহিত করে তোয়াজ করছে, এটা কিছুতেই ধরতে পারে না।

দেখি, আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটেছে রায় বাহাদুরের মুখে। বললেন, হ্যাঁ—তোমরা বলবে আবার ঐ সব! পারলে চিঁড়ের মতো আমায় দাঁতে চিবিয়ে ফেলতে চায় তোমাদের দল।

জিভ কেটে বলি, ছি ছি! মানুষ চিনি নে আমরা? নিতান্ত উপরওয়ালার

হুকুমে যা-কিছু করতে হয়। তবু তো কত দিক দিয়ে আপনি কত বাঁচিয়ে যাচ্ছেন! সদাচার নিরহঙ্কার দিল-দরিয়া মানুষ—

একেবারে নির্জলা মিথ্যা। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনেন, ঘুষ খাবার যম, ধোপাকে নাকি গারদে পুরবার হুমকি দিয়ে বিনা-পয়সায় কাপড় কাচিয়ে নেন, কৃপণের যাসু একেবারে। অথচ আমার প্রতিটি কথা রায় বাহাদুর বিশ্বাস করে যাচ্ছেন।

বলছি, সদাচার আদর্শ মানুষ বলেই তো লাফি[illegible]ফিয়ে প্রোমোশান হচ্ছে। গুণের আদর সব জায়গায়। গুণবানের ভগবান সহায়।

রায় বাহাদুর বলতে লাগলেন, লিটারেট-কনেস্টবল হয়ে ঢুকি, বুঝলে? লাট সাহেবকেও কোন দিন খাতির করে চলি নি।

আমি সবিনয়ে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি—

সাদা চামড়া মাত্রেই পীর-পয়গম্বর যার কাছে, নিভৃত [illegible]রের মধ্যে তার মুখের সামনে হাসি ঠেকানো দুঃসাধ্য হচ্ছে ক্রমেই। এই হাসি রোধ করে আর কিছুক্ষণ যদি এমনি চালিয়ে যেতে পারি, আজকের গ্রহ কেটে যাবে—নিশ্চিত বলা যায়।

হরেন জল নিয়ে এল এতক্ষণ পরে। রায় বাহাদুর বললেন, শুধু জল নিয়ে এলে? চা দিতে বলো তোমার খুড়িমাকে।

খুড়িমাটি দ্বারপ্রান্তে। অচেনা মানুষ বলে সমীহ নেই—ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ঠাকুর আসে নি। রান্না-বান্নার ঝক্কি কুলোব, তার উপর মিনিটে মিনিটে চায়ের হুকুম। অঢেল গতর নেই আমার।

রায় বাহাদুর এতটুকু হয়ে গেলেন, মুখে একটি কথা জোগাল না। দেখলাম, এ মানুষকে জব্দ করবার ঐ একজন—খুড়িমা। এলোমেলো [illegible]লের বোঝা মুখের উপর পড়ে যেন কেশর-ফোলানো সিংহীর মতো দেখাচ্ছে খুড়িমাকে।

কোণে-রাখা সেই ছাতাটার উপর হঠাৎ শ্যেন-দৃষ্টি পড়ে গেল তাঁর।

দেখ কাণ্ড ভূতনাথের, এইখানে এনে রেখেছে। সকাল থেকে ছাতা-ছাতা করে বেড়াচ্ছি, খালি-মাথায় ধরণী কলেজে গেল বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে। ওরে ভূতো—

বলে গর্জন করে চললেন ছাতার দিকে।

আন্দাজ করো ভাই আমার অবস্থাটা। বলব, ও ছাতা আপনাদের নয়, আমার—আমার—কিন্তু গলা দিয়ে কথা বেরুল না। আর তাতে বেশি বিপদ—ঐ নিয়ে কথা-কথান্তর টানা-হেঁচড়ায় বেরিয়ে পড়বে ভিতরের জিনিব। খুড়িমা গিয়ে ছাতা তুলে নিলেন। চোখ ফিরিয়ে আমি অবশ্য দেখি নি। বুঝতে পারছি, আর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র আমি মুক্ত অবস্থায় আছি, রায় বাহাদুর বোতাম টিপবেন, এসে পড়বে ওরা বাইরে থেকে—হাতে হাতকড়ি পরাবে।

নির্লিপ্ততার ভাণ করে আমি একেবারে ওদিকে তাকাই নি। কিন্তু আশ্চর্য—ঘটল না কিছুই। আমি যথারীতি রায় বাহাদুরের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম, তোয়াজ করলাম তাঁকে। তাঁর ক'টা খবর জানবার ছিল; সমস্ত নিরসন করে যখন বেরুচ্ছি, তিনি এত খুশি হয়ে উঠেছেন যে উঠে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এলেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

এর বছর চারেক পরে জেল থেকে সত্ত বেরিয়ে এসেছি। চিত্রা-সংঘের মেয়েরা নিমন্ত্রণ করল। সবই প্রায় কলেজের মেয়ে, আমায় ঘিরে ফেলল একেবারে। বলে, যেতেই হবে দাদা, কবে নিয়ে যাব বলুন। সংঘের মেয়েরা ছবি আঁকে, তার একজিবিসন খুলতে যেতে হবে আপনাকে।

আশ্চর্য হয়ে বলি, ছবির আমি কি বুঝি? নিতান্ত অরসিক আনাড়ি—ছবি দেখা, গান শোনা, এ সবের সময় পেলাম কখন? তা হলেও তো বুঝতাম, মানুষ হতে পেরেছি কতকটা।

কিন্তু দীপ্তি বলে মেয়েটা একেবারে নাছোড়বান্দা। আবদারের ভঙ্গিতে বলে, সেই তো ভালো—পয়লা বার দেখতে মজা লাগবে। আর ছবির নিচে আমরা নাম লিখে লিখে দিয়েছি—নদীর ছবি বাছুর বলে মনে হলে তলার নামটা পড়ে নেবেন।

শুধু দেখাই নয়—বক্তৃতা করতে হয় যে ভাই! চিত্রকলার প্রগতি—স্বদেশীয় ঐতিহ্য—ঐ সব জাঁকালো কথার মানেই বুঝি নে—

দীপ্তি বলে, কিছু ভাববেন না—পূর্বাচার্যেরা বিস্তর লিখে গেছেন, গণেশের দেহে হাতীর মুণ্ড জুড়ে একটা কিছু দাঁড় করালেই হল। কে মিলিয়ে দেখছে, সবাই তো হাই তুলবে বসে বসে। আর আপনার সময় না থাকে, বলুন, বক্তৃতা আমি লিখে দিয়ে যাব। আপনি শুধু গড়গড় করে পড়ে খালাস।

হাত জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে মুখের দিকে চায়। তুলোর মতো এমন কোমল হাত—আর মুখে মাথায় কি মেখেছে, গন্ধে মন ঝিমঝিম করে। ঘাড় দুলিয়ে বলে, যাবেন—যেতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত যাবই না, মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। একটা ছেলে থাকত আমাদের ওখানে, তাকে বলা ছিল—কড়া নাড়লে সে বলে দেবে, অসুখ করেছে—শয্যাশায়ী হয়ে আছি আমি। কিন্তু দীপ্তি আন্দাজে বুঝেছিল বোধ হয়, নিজে চলে এল। ছাড়বার পাত্র কি ও-মেয়ে? সেই ছেলেটিকে বলে, আহা-হা—কি অসুখ করল আবার? চলুন তো তাঁর ঘরে, দেখে আসি।

ঘরের ভিতর সভয়ে তাড়াতাড়ি আমি উঠে দাঁড়ালাম। জেরায় ওর সঙ্গে পেরে উঠব না। দীপ্তি এলে পরমোৎসাহে বললাম, এসে গিয়েছ, মাথা ধরেছিল—সে কিছু নয়—সেরে গেছে এখন। চলো—

গেলাম চিত্রা-সংঘে। বিরাট আয়োজন। হল ভাড়া করে ফুলে আলপনায় নিখুঁত করে সাজিয়েছে। চিত্র-প্রদর্শনী উপলক্ষ মাত্র—আমাকে নিয়েই মাতামাতি। কেবল মেয়েদেরই নিমন্ত্রণ—হল ভরে গেছে, জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েও রয়েছেন অনেকে

বেদির উপর আমার পাশে দাঁড়িয়ে দীপ্তি পরিচয় দিতে লাগল। আমি যে কত বড়, শুনতে শুনতে দু-কান জ্বালা করতে লাগল, কপালের ঘাম ঝরে পড়তে লাগল টপ-টপ করে। যা কিছু করেছি, তাতে বস্তর রং ফলিয়ে—এবং যা করি নি, করব বলে কল্পনাতেও আনি নি, সমস্ত নির্বিচারে একসঙ্গে মিশিয়ে বলে যেতে লাগল। পরিচয়-পর্ব শেষ করে বলল, এ হেন বিরাট ব্যক্তির সম্বর্ধনা করে সংঘ ধন্য হবে এবার।

সম্বর্ধনার জন্য পাঁচ-ছ'টা মেয়ে এগিয়ে এল। সকলের আগে যেটি, তার

নাম সুধা—হাতে সেফটি-রেজারের ব্লেড। সেই ব্লেড বসিয়ে দিল বাঁ-হাতের কড়ে-আঙুলের ডগায়। রক্ত বেরিয়ে এল ব্লেড বেয়ে। রক্তাক্ত আঙুল আমার কপালে ঠেকিয়ে কম্পমান কণ্ঠে সমস্ত হল প্রতিধ্বনিত করে সুধা বলে উঠল, ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা—

দস্তুরমতো এক থিয়েটারি নাটক ভায়া। অন্যের কথা কি বলি—আমার অবধি গা শির-শির করে উঠল। তাকিয়ে দেখি, হলের সর্বত্র চোখ মোছামোছি চলছে। দীপ্তির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার চোখে আগুন। সুধার পা টিপছে, ও কি? উনি এলেন কি করে?

সুধাও সবিস্ময়ে বলে, ওঁকে তো নেমন্তন্ন করা হয় নি। কেন এলেন?

যাঁকে নিয়ে আলোচনা, গোটা পাঁচেক বেঞ্চির পিছনে তিনি বসেছেন। মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মোটা চেহারা আর শাড়ির পাড় দেখে গিন্নিগোছের বলে অনুমান হচ্ছে।

দীপ্তি বলে, মতলব নিয়ে এসেছেন। ওঁর এখানে থেকে কাজ নেই, যেতে বলে দিই।

সুধা বলে, তা হয় না—ছিঃ! এসে খুবই অন্যায় করেছেন, কিন্তু সভার মাঝখান থেকে ভদ্রমহিলাকে অপমান করে তাড়ানো—না-না, ওসব করতে যাস নে দীপ্তি।

দীপ্তি আগুন হয়ে বলে, ভদ্র হলে কখনো যেতাম না। মেয়েমানুষ অবধি চরবৃত্তি করে—ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত।

দীপ্তি সেইখানে গেল। কি বলল তাঁকে, উঠে তিনি বারাণ্ডায় চললেন তার সঙ্গে। যাবার সময় দু-দিকে সাজানো বেঞ্চির মাঝখানে যে পথ—সেখানে এসে পূর্ণ দৃষ্টিতে এক বার তাকালেন আমার দিকে। চমকে উঠলাম। এ মুখ দেখেছি যেন কোথায়। কোথায়···কোথায়···মনে এসেও আসছে না। মহিলাটি হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সোজা আমার বেদির কাছে চলে এলেন। বললেন, চলে যাচ্ছি, আমি থাকায় মেয়েদের অসুবিধা হচ্ছে। একটা কথা তোমায় বলব বলে এসেছিলাম। সেই একদিন একটা ছাতা নিয়েছিলাম মনে

আছে? সেটা তোমার জিনিষ—আমাদেরটা পেয়ে গেছি তারপর। একদিন গিয়ে নিয়ে এসো, যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

এখন চিনেছি—রায় বাহাদুরের পত্নী। অত কথা না বললেও চিনতে পারতাম, চেহারা স্পষ্ট মনে পড়েছে। বরঞ্চ কথার সুরেই যেন বিভ্রম জায়গায়—সেদিন অত প্রতাপ দেখেছিলাম, সেই কণ্ঠে যে এমন কান্নার স্বর বেরোয়, স্বকর্ণে না শুনলে বিশ্বাস করতাম না।

যেতে যেতেও মুখ ফিরিয়ে আর একবার বললেন, যেও বাবা কিন্তু—নিশ্চয় যেও। বাড়ি তো জানোই। দুপুরবেলা যেও পরশু দি—উনি অফিসে থাকবেন, সেই সময় যেও।

ঘাড় নেড়ে সসম্ভ্রমে বললাম, নিশ্চয় যাব খুড়িমা—

কিন্তু সেদিনটা মফস্বল থেকে অনেকগুলো ছেলে এসে গেল —রি দরকারে। সমস্ত মিটিয়ে বেরুতে চারটে বাজল। তা হোক, রায় বাহাদুরের অফিস থেকে ফিরে আসতে এখনো ঘণ্টা দেড়েক দেরি। অনেক সময় আছে।

একটা ছেলে দেখলাম, পায়চারি করে বেড়াচ্ছে রায় বাহাদুরের বাড়ির সামনে দিয়ে। এক একবার মোড় অবধি চলে যাচ্ছে। কাঁটা-তারের বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ইতস্তত করছি, বন্দুক নিয়ে এক কনেস্টবল পাহারা দিচ্ছে, কটমট করে তাকাতে লাগল সে আমার দিকে। দ্রুতপদে ছেলেটা এসে পড়ল। বলে, মা সেই বেলা একটা থেকে আমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এ বেটারা কি বলে না বলে, ভিতরে খবর দেয় কি না দেয়—

স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছেলেটা। হাসলে সাদা দু-পাটি দাঁত চিকচিক করে ওঠে, চমৎকার দেখায়। উপরের ঘরে যেখানে আর একদিন আমি এসেছিলাম, সেইখানে ছেলেটির সঙ্গে গেলাম। খুড়িমা সঙ্গে সঙ্গে এক গাল হেসে পাশের দরজা দিয়ে নিয়ে গেলেন শোবার ঘরে। খাটের একপাশে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, বোসো। ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, ধরণী পড়াশুনো করে এখানে,

শোয়ও। মিছেকথা বলে এনেছি তোমাকে। ছাতা নেই—কম দিন তো হল না, চার বছর—অতদিন থাকে কি ছাতা?

আমি বললাম, পুরানো নড়বড়ে এক ছাতার লোভে এসেছি—তাই আপনি মনে করেন?

কি বলতে গিয়ে সামলে গেলেন তিনি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, আর যে কি লোভে এসেছ, জানি নে। যার জন্যই এসে থাক, জিনিষপত্র কিছু নেই। হারিয়ে গেছে, কি কোথায় যেন ফেলে দিয়েছি—কিছু মনে পড়ছে না বাবা।

হেসে ফেলে বললাম, মনে পড়লেও ছেলের হাতে কখনো তা দেবেন না, জানি। দরকারও নেই। আপনার সঙ্গে কোন এক দিন দেখা করে কথাবার্তা বলবার ভারি লোভ ছিল, এদ্দিনে তাই ঘটল।

আমার কথা শেষ না হতেই তিনি চলে গেলেন। ঐ মোটা মানুষ—পাখীর মতো উড়ে গেলেন যেন। পরক্ষণেই থালা-বাটি সাজিয়ে নিয়ে এলেন। লুচি-তরকারি-মিষ্টি—আমার মতো চার জনের খাবার। বললেন, উনি অফিসে গেলে তখন থেকে বসে বসে এই সব করেছি। একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে—কি যে কষ্ট হচ্ছিল! ভাবলাম, এলে না বুঝি! ওঠো বাবা, দেরি করছ কেন?

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম—দেখি, মুখ তাঁর পাংশু হয়ে গেছে। বললেন, খাবে না? দেখ, রক্ত দিয়ে ফোঁটা দিল তোমার কপালে। আমরা তা পারি নে, তোমাদের মতো সোনার চাঁদদের নাস্তানাবুদ করা চাকরি ওঁর—আমাদের গায়ে তো রক্ত নেই, বিষ। কিন্তু এক টুকরো লুচি কি দাঁতে কাটবে না? এত কষ্ট করে করলাম।

স্বর কাঁপছে, চোখ তাঁর ছলছলিয়ে উঠছে বুঝতে পারছি। বললাম, নিশ্চয় খাবো। এত বোকা ভাবছেন কেন? কে এমন সাজিয়ে আমাদের খাবার খাওয়ায় বলুন দেখি?

তিনি বললেন, দেরি করে এলে—বসে দু-একটা কথা বলব, তার সময়

হবে না। উনি এসে পড়বেন। অবিশ্যি তোমাদেরও গল্প করলে চলে না—কত কাজ করতে হয়!

থেমে গেলেন সহসা। একটু যেন ইতস্তত করলেন। বললেন, ধরণী তোমাদের বড় ভালবাসে। আমাদের লজ্জায় ও কথা বলতে ভরসা পায় না। তোমার কাছে একটু যদি যায় আসে, দুটো ভাল কথা শুনতে চায়—তাড়িয়ে দেবে বাবা দুয়োর থেকে?

হেসে বললাম, এত খারাপ আমরা—যে যায়, তাড়িয়ে দিই? লোকে বুঝি আমাদের এমনি বদনাম দিয়ে বেড়ায়! যার পাওনা-গণ্ডা, সে বুঝে নিতে যাবে, আমরা তাড়াবার কে? লড়াই জেতার অনেক দেরি এখনো—দিল্লি অনেক দূর! নতুন কালের মানুষ না এলে যাত্রা মাঝপথে থেমে যাবে যে!

খেতে বসেছি তারপর। তিনি আমার থালার সামনে মেজের উপর বসেছেন—ক্রীং-ক্রীং করে টেলিফোন বেজে উঠল ও-ঘরে। বিরক্ত মুখে তিনি উঠলেন।

ফিরে এসে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, কপাল আমার! উনি আসছেন এখনি। কোথায় বেরুবেন কলকাতার বাইরে, স্যুটকেশ গুছিয়ে রাখতে বললেন। একটু যদি সকাল সকাল আসতে!!

মাছের তরকারির একটুখানি ঢেলে নিয়েছি। ছেলেকে ডেকে তিনি বললেন, ধরণী, তোর দাদাকে প্রণাম করেছিস?

খাচ্ছি—সেই অবস্থায় ছেলেটা থতমত হয়ে পায়ের কাছে প্রণাম করল। বাঁ-হাতে তাকে তুলে ধরলাম।

খুড়িমা বললেন, হাত ধুয়ে উঠে পড়ো বাবা। আমার কপাল! মোটরে আসতে বেশি সময় লাগে না তো!

উঠে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামছি।

আর একদিন আসবে তো বাবা? মিথ্যে বলে ডেকে এনে হয়রান করলাম।

আসব, নিশ্চয় আসব মা—

'খুড়িমা' নয়—'মা' ডাক বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। যখন জেলে ছিলাম, মা মারা গিয়েছেন। শেষ দেখাটাও দেখতে পারি নি।

দিল্লি চলো

চলো দিল্লি—

পাহাড়-জঙ্গল নদী-সমুদ্র পার হয়ে বাংলার সীমান্ত অবধি তারা এসেছে। এসে পড়েছে। দিল্লি দখল করবে, লাল-কেল্লায় বিজয়-পতাকা উড়াবে।

দূর-গ্রামেও খবর পৌঁছে গেছে। কিন্তু চেঁচিয়ে বলবার জো নেই কানাকানি চলছে, দুটো মানুষ একত্র হলেই ফিসফিসিয়ে ঐ কথা। পথ সাফাই থাকে যেন! দেশের মানুষ যারা আছ, শোন—দূরের ছেলেমেয়েরা ঘরে ফিরছে, পায়ে একটা কাঁটাও না ফোটে—খেয়াল রেখো।

চালের কলের সামনে পাঁচ-শ মানুষ জড় হয়েছে, এক কনিকা চাল বাইরে যেতে দেবে না। শুয়ে পড়েছে পথের উপর। মোষের গাড়িগুলো আটকা পড়ে গেছে গেটের পিছনে। অশোকবাবু দারোগা দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছেন, চালাও—চালাও—। কিন্তু মানুষ ঠেলে গাড়ি চলবে কি করে? গাড়োয়ান যদিই বা চালাতে যায়, মোষ নড়ে না। একের পিছে আর এক—গাড়িগুলো সারবন্দি সেই সকালবেলা থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

ঈশান মাথা ভাঙাভাঙি করেছিল, যাস নে তুই ওদিকে জলধর, খবরদার! কি দায় পড়েছে? গোলায় যা আছে, অঘ্রাণ অবধি চালিয়ে দেবো। আমাদের ভাবনা কি? এর উপরেও কুসুম বাইরে থেকে শিকল আটকে দিল। কিন্তু কি ছেলে আজকালকার! এদের চালচলতি আলাদা—একবার যা মাথায় ঢুকবে, কিছুতে তার অন্যথা হবে না।

অশোকবাবু বলেছিলেন, এ অঞ্চলের ধান-চাল সরানো হবে, নয় তো জাপান এসে পড়লে সুবিধা হয়ে যাবে তাদের।

জলধরেরা বলাবলি করে, জাপান না হাতী! যারা আসছে, তারা ঘরের ফৌজ—নেতাজির দল। পিছু হঠতে হঠতে ইংরেজ তো অন্দর অবধি এসে পৌঁচেছে—ধান-চাল না সরালে কি খেয়ে তারা আমাদের ছেলেদের কোতল করবে?

কুসুম ঘরে আটকাল তো জলধর করল কি—ছ্যাচা-বেড়া বেয়ে চাল অবধি উঠে বেড়ার মাথার উপর দিয়ে বাইরের দিকে এল। তারপর ঐ অত উঁচু থেকে এক লাফ।

কে রে? শব্দ শুনে কুসুম রান্নাঘর থেকে বেরুল। জলধর ততক্ষণে চোঁচা দৌড় দিয়েছে।

হাতে বন্দুক, অশোকবাবু নিজে কনেস্টবলদের আগে গিয়ে দাঁড়ালেন। চালের গাড়ি রওনা করতেই হবে। লাঠি মেরে দেখা গেল, জনতা ওঠে না। তারপর গুলি। জন দুই-তিন আর কোন দিনই উঠবে না, বাকি সকলে উঠল—হৈ-হৈ করে ছুটে চলল। অশোকবাবু ইতিমধ্যে সরে পড়েছেন। থানার দিকে ওরা ছুটেছে। ক'টা বন্দুক আছে অশোকবাবুদের, কতগুলো গুলি? রিপোর্টে এসব কিছু-কিছু আপনারা পড়েছেন। যা পড়েন নি তাই এবার বলি।

মিলে ঢোকবার রাস্তার পাশে যে পগার, জলধর গুলি খেয়ে তার মধ্যে পড়ে গেল। বুদ্ধি করে কনুয়ে ভর দিয়ে দিয়ে সে কালভার্টের নিচে ঢুকল। সেই জন্য কারও নজর পড়ে নি, হাসপাতালে যেতে হল না তাকে। হিংস্র জনতা থানা-মুখো ছুটেছে, মিলের বড়-গেটও এদিকে বন্ধ—জনকয়েক সেই ফাঁকে চুপি চুপি জলধরকে তুলে বাড়ি নিয়ে এল। ছেলের দিকে চেয়ে দেখে ধ্বক্ করে ঈশানের চোখ জ্বলে উঠল। কাউকে একটা কথা না বলে সে বেরিয়ে পড়ল। মাথা খুঁড়তে ইচ্ছা করছে কুসুমের—নিজের শরীর ভাল নয়, ছেলের ওই অবস্থা, যে-মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় এদের সান্ত্বনা দেবে সে নিজেই ক্ষেপে বেরুল।

জনতা থানায় ঢুকে রেকর্ড পুড়িয়েছে, জিনিষ-পত্র তছনছ করেছে। শেষ অবধি তবু বিজয় হল অশোকবাবুদের। হবে না কেন—ওদিকে বন্দুক-বেয়নেট,

আর এদের কেবল ঈশ্বর-দত্ত হাত দু-খানা। ঈশান পিছন দিকে ছিল, সামনে পৌঁছবার আগেই ফিরবার হুকুম হল। বাড়ি এসে সমস্তটা দিন সে চুপচাপ একটা জায়গায় বসে আছে। স্নান করে নি, খায়ও নি কিছু। যেন তার সম্বিত নেই। কি দেখল, কি আশ্চর্য ব্যাপার আজ সে দেখে এসেছে!

এত সহজ মানুষের মরা! মরারও নেশা আছে, চোখের উপর প্রত্যক্ষ করে এল। যত মারা পড়ছে, তত এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ। ত্রৈলোক্য একটা ছড়া বলে থাকে—

মাছ মানুষ মশা,
যত মারবে ততই কোল-ঘেঁসা!

ছিপ নিয়ে বসে মাছের এই স্বভাব অনেকবার ঈশান লক্ষ্য করেছে। যে চার থেকে যত মাছ উঠছে, ততই আরও মাছ লাগছে সেই জায়গায়। মশার ব্যাপারেও তাই—চটাপট যত মারবে, তত ভনভন করে আসবে। মানুষের সম্পর্কে যে মারের কথা ত্রৈলোক্য বলে, সেটা মৃত্যু নয় অবশ্য—প্রহার। যার যত হাঁকডাক ও অত্যাচার, লোকে তত বেশি তার খোশামুদি করে, কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আজকে মৃত্যুর সামনেও দেখে এল অবিকল সেই রীতি। একটা মানুষও ফিরত না সম্ভবত—ক্ষমতার ঘাঁটি দখল তারা করবেই, না পারে উঠানে সবুজ ঘাসের উপর মরে মরে পড়ে থাকবে। শ-তিনেক শঙ্খের ধ্বনি ছাপিয়ে সুতীব্র হুইশিল বেজে ওঠে হঠাৎ। পিছু হঠবার সঙ্কেত। সামনে মুখ রেখে ধীরে ধীরে সকলে পিছন দিকে পা ফেলতে লাগল। তখন অশোকবাবুরা বন্দুক ছোঁড়া বন্ধ করলেন। ভিড় ঠেলে ঈশান প্রথম সারিতে যাচ্ছিল, হুইশিল বেজে ওঠায় ফিরতে হল।

বাড়ি এসে দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চুপচাপ সে বসে আছে, শিউরে শিউরে উঠছে। চাট্টি চিঁড়ে ভিজিয়ে এনে কুসুম একবার খাবার কথা বলতে এসেছিল, ঈশান চোখ তুলে চাইতে সভয়ে সে স্তব্ধ হল। ঘরের মধ্যে অচেতন জলধর রক্তচক্ষু মেলে এক-একবার এখন তাকাচ্ছে। তার দৃষ্টিও এমন ভয়ানক নয়।

প্রহর-দেড়েক রাত্রে কুসুম একবার ডুকরে কেঁদে উঠল। মজা-পুকুরের দক্ষিণ

পায়ে ত্রৈলোক্যর বাড়ি—সে আর তার ভাইপো হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। করছ কি জলার মা ? অবুঝ হোয়ো না। টের পেলে এখুনি সদরে চালান দেবে তোমার ছেলে, লাস-কাটা ঘরে ফেলে আগা-পান্তলা চিরবে। বাসি-মড়া ফেরত দেবে না—মেথর-মুদ্দফরাসে ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে ফেলে দেবে। চুপ-চুপ !

শুনে কুসুম হিম হয়ে যায়। কালও ঘুমের সময় যার শিয়রে বসে বসে পাখা করেছিল, তাকে সদরে পাঠাবে বুক-পেট-হাত-পা-গলা কেটে কেটে শত খণ্ড করবার জন্য। কান্না বন্ধ হয়ে গেল। গলা বুঁজে গেছে, আওয়াজ বেরোবার এতটুকু আর ফাঁক নেই।

আরও অনেক রাত্রে চাঁদ ডুবে গেলে ত্রৈলোক্যরা খুড়ো-ভাইপো এবং আর জন দুই জলধরকে কাঁধে নিয়ে রওনা হল। নিঃশব্দ—এক-একবার মৃতের কানের কাছে ফিস-ফিস করে রীত-রক্ষা করছে, বল হরি—হরিবোল !

কুসুম ঈশানের পায়ে পড়ে মিনতি করে, এবার একটু কাঁদি। না কেঁদে মরে গেলাম যে ! একটুখানি একবার কাঁদতে দাও।

ঈশান ঘাড় নাড়ে। উঁহু—শ্মশানের চিতে থেকে তুলে নিয়ে আসবে। পুড়ে আগে সাফ হয়ে যাক। কাঁদিস তার পরে।

দিন-দশেক কাটল। কুসুমের জন্য ভয় হল ঈশানের। শরীরের এ অবস্থা বলেই বেশি ভয়। চরকা ছিলই, একরাশ তুলোর পাঁজ সে এনে দিল ত্রৈলোক্যর বাড়ি থেকে।

চরকা কাট্ বউ, মন ঠাণ্ডা হবে।

সুতা কাটছে কুসুম। ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেছে, মোটে আর নজর চলছে না।

থাক বউ, পাঁজগুলো মিছে বরবাদ করছিস।

কুসুম কাতর হয়ে বলে, চলো—ঘুরে আসি কোনখান থেকে

কোথায় যাবি ? ম্লান হাসি দেখা দিল ঈশানের মুখে। বলে, সবখানেই ওদের রাজত্ব। পালিয়ে বাঁচবি কোথা ?

বনে-জঙ্গলে চলো যাই। একটুখানি আমি কাঁদব।

মাথায় হাত বুলিয়ে ঈশান সান্ত্বনা দেয়। কাঁদিস—জরিমানার ফয়শালাটা আগে হয়ে যাক। গ্রামসুদ্ধ পাইকারি জরিমানা। জলধর কোথায় চলে গেছে না গেছে—থানা-লুঠের মধ্যে সে ছিল, টের পেলে জরিমানা আরও বেশি করে চাপাবে আমাদের ঘাড়ে।

জরিমানার পরিমাণ জানা গেল—ঈশানের দিতে হবে তের টাকা আট আনা। আনা অবধি হিসাব হয়েছে, কর্তৃপক্ষের এমন সূক্ষ্ম বিচার! দীর্ঘ তালিকাখানা হাটখোলায় লটকে দিয়েছে। ঢেঁড়া পিটিয়ে তিন-চার তারিখ ইতিমধ্যে তাগাদা হয়ে গেছে অবিলম্বে টাকা জমা দিয়ে আসবার জন্য।

রাত্রিবেলা হঠাৎ খুব বাদলা নেমেছে। ঘরের মেজেয় গর্ত খুঁড়ছে ঈশান। কোমর অবধি ডুবে গেছে। জানলার একটা কবাট ভাঙা। তালের পাতায় ঢেকে দিয়েছিল—হাওয়ায় তালপাতা উড়িয়ে নিয়ে গেছে, বৃষ্টির ছাঁট ঘরের ভিতর ঢুকছে। দু-তিন ঘণ্টা কোদাল চালিয়ে ঈশানের হাঁপ ধরে গেছে, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

গুঁড়ো মাটি ফের গর্তের ভিতর পড়ে। এনামেলের ভাঙা সানকি দিয়ে কুসুম বসে বসে মাটি সরাচ্ছিল গোড়ার দিকে। ঈশান তাড়া দিয়ে উঠতে সরে গিয়ে এখন এক কোণে বসে আছে। কাজ করতে করতে আবার এক সময় ঈশানের নজর পড়ল তার দিকে। সদয় কণ্ঠে বলে, গুড়ের নাগরির মতো গোঁজ হয়ে বসে রইলি কেন রে? দেরি আছে, গড়িয়ে নে ততক্ষণ।

কুসুমের হাই উঠছে। এ অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে ঠায় বসে আছে, অস্বস্তি লাগবারই কথা। শরীরেরও ক্ষতি হয় ওতে। ঈশান বলে, শুয়ে পড়্—বুঝলি? একটা মাদুর-টাদুর পেতে নে কোথাও—

কুসুম বলে, কোথায়?

ছোট ঘর—তোলা মাটি সমস্ত মেজেয় ছড়িয়ে পড়েছে। যে কোণটায় কুসুম বসে আছে, সেখানেও মাটি গড়িয়ে আসছে। চারিদিক তাকিয়ে একটু হেসে কুসুম বলল, কোন জায়গায় মাদুর পাতি—জায়গা দেখিয়ে দাও।

বেকুব হয়ে গিয়ে ঈশান বলে, আচ্ছা—হয়ে এল আমার। একটুখানি কাত হয়ে চোখ বুঁজে পড়ে থাক ততক্ষণ।

অনেক বার বলা-কওয়ায় কুসুম কাত হল বটে, কিন্তু চোখ বুঁজল না। চেয়ে চেয়ে দেখছে। কোদাল নিয়ে ঈশান গর্ত থেকে উঠল। বৃষ্টি ধরে গিয়েছে সেই সময়টা, রাত ঝিমঝিম করছে। ঈশান উঠানে নামতে কুসুমও ধামা নিয়ে পিছু পিছু বেরুল। গোলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ধামায় করে ধান ভরে দিলে কুসুম নিয়ে নিয়ে ঘরের ঐ গর্তে ঢালবে।

ঈশান তাড়া দিয়ে ওঠে, আচ্ছা কাজ-পাগলী তো! তোকে করতে হবে না—শেষটা যে মুখ থুবড়ে পড়বি ধানের ধামা নিয়ে।

গোলার ভিতরে ঢুকল না ঈশান, গুঁড়ি মেরে তলায় চলে গেল। তলার বাখারি কেটে দরমায় মাঝারি-গোছের এক ছেঁদা করল। ধান বের করবার এই এক সংক্ষিপ্ত উপায়। ছেঁদার মুখে ধামা পেতে কাঠি দিয়ে নাড়া দিচ্ছে, ভুস-ভুস করে ধান পড়ছে। গর্তে নিয়ে নিয়ে ঢালছে সেই ধান। গোলা শূন্য হয়ে আসছে এখন। কুড়িয়ে সর্বসাকুল্যে দশ-বারো ধামা হল। সমস্ত গর্তে ঢেলে খেজুর-পাতার পাটি চাপা দিল উপরে। তার উপর মাটি। বাড়তি মাটি যা ছিল কুড়িয়ে নিয়ে ছড়াল—উঠানের পাশে মূলা-পালঙের ক্ষেত করেছে, তার উপর। গর্ত খুঁড়েছিল—সেটা কোন রকমে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। গোবর-মাটি নিয়ে কুসুম ওদিকে লেপতে বসে গেছে। এবার ঈশান আপত্তি করে না। শেষ হয়ে গেলে প্রসন্ন মুখে বলল, ব্যস—এখন শুকোতে যা দেরি। শুকিয়ে গেলে ঐ জায়গায় কাঁথা-মাদুর একেবারে কায়েমি করে পেতে নিবি বউ।

গরু-বাছুর ধান-চাল বাসন-কোসন ইত্যাদি অস্থাবর সরানোর ধুম পড়ে গেছে পাড়ার মধ্যে। দাওয়ায় বসে ঈশান আর ত্রৈলোক্যর শলা-পরামর্শ চলে, আর ঘরের ভিতর নূতন আশঙ্কায় কুসুমের বুকের ভিতরে গুর-গুর করে ওঠে। মেয়ে-মানুষ—তাই তার সঙ্গে কথাবার্তা হয় না, সে-ও সাহস করে জিজ্ঞাসা করে না কোন-কিছু। মেজে লেপতে লেপতে এইবার সে প্রথম বলল, কি কাণ্ড বলো তো?

কেড়ে নিয়ে যাবে বউ, সেরে-সামলে না রাখলে। একটু থেমে তিক্তকণ্ঠে আবার বলল, আমাদের চালের ভাত খেয়েই তো জোর আসবে আমাদের উপর বন্দুক ছুঁড়বার।

পূর্ণ কনেস্টবল ও আর ক-জন এসেছে।

টাকা দাও ঈশান—

মেজে এই ক-দিনে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। কুসুম বিছানা-মাদুর পেতে শুয়ে আছে তার উপর। আর কিসের ভয়? ঈশান জবাব দিল না।

তোমার ধান ক্রোক হয়েছে। জরিমানা আদায় করে যা বাড়তি হবে, ফেরত পাবে। গোলার চাবি দিয়ে দাও।

ঈশানের যেন কানেই যাচ্ছে না। সে উঠে তামাক সাজতে চলল।

পূর্ণ উত্তেজিত হয়ে বলল, কালা হয়েছ? তালা ভেঙে ফেলব—বুঝলে? হুকুম আছে সেই রকম।

দাওয়ায় ঠেশান-দেওয়া কুড়াল থাকে, কুড়াল তুলে পূর্ণ গোলার দিকে ছুটল। গিয়ে দেখে, দরজা হা-হা করছে—তালাই নেই।

তামাক ধরিয়ে ঈশান তখন নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

ধান গেল কোথা?

হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে ঈশান ভদ্রতা করে বলে, খাও—

লাথি মেরে কলকে উলটে দিয়ে পূর্ণ প্রশ্ন করে, ধান কোথা সরিয়েছিস, তাই বল্ আগে—

নিজের ক্ষেতের ধান—বাজে লোককে কৈফিয়ৎ দিতে গেলাম কেন?

বাজে লোক হলাম আমি? চোখ পাকিয়ে পূর্ণ চেয়ে রইল, ক্ষণকাল কথা বলতে পারে না। তারপর বলল, আচ্ছা—নিয়ে আসছি। বাপ-দাদারা এসে দাঁড়ালে কি করিস দেখা যাবে।

বাপ-দাদা আমার নয়, তোদের। রুদ্র মূর্তিতে ঈশান নেমে এল।

কুড়াল কেড়ে সেই কুড়াল উঁচিয়ে ধরে বলে, বেরিয়ে যা হারামজাদারা আমার উঠান ছেড়ে। বেরো—

গোলযোগটা ভাল রকম ঘটল। বিদ্রোহী এলাকা ঠাণ্ডা করবার জন্য ফু-লরী সিপাহি এনে মজুত করা হয়েছিল, তার উপর খোদ মহকুমা-হাকিম সেইদিন থানায় উপস্থিত আছেন একটা তদন্তের ব্যাপারে।

কুসুম কাতরাচ্ছে। ঈশান টেমি নিয়ে বেরুচ্ছিল, বড় কাতরানি শুনে আবার তার পাশে এসে একটু বসল। এ অবস্থায় একা ফেলে যেতে সাহস হয় না।

বাইরে থেকে অশোকবাবু হাঁক দিলেন, এদিকে আয়—

ঈশান উঁকি মেরে দেখে, পুরো এক পল্টন তার উঠানে। মাথায় গোলমাল লেগে যায়। দরজায় তাড়াতাড়ি সে হুড়কো এঁটে দিল।

অশোকবাবুর ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলে ওঠে। বেরুবি নে?

ঈশানও মরীয়া। নিজের ঘরে রয়েছি—বেরুব কি কারো কথায়? আমার যখন খুশি হবে, সেই সময় বেরিয়ে আসব।

ঘর? যখন খুশি হবে…উঁ? রাগে অশোকবাবু থরথর করে কাঁপছেন। দেখাচ্ছি খুশিরাম, কি রকম ঘর হয়েছে তোর!

চালে দেশলাই জেলে ধরলেন। আগুন ধরে না, কাঠি নিভে গেল।

পূর্ণ বলে, পাকাটি দেখে এলাম হুজুর খালের ধারে। হুকুম করেন তো তাই এক বোঝা নিয়ে আসি।

শুনতে পেয়ে ঈশান ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করে ওঠে, খবরদার বলছি তোমাদের। খবরদার!

পাকাটি এনে কাড়ু তৈরি হল। ঈশানের সেই টেমি দাওয়ার পাশে তখনো জ্বলছিল, টেমিতে কাড়ু ধরিয়ে নিল।

পোয়াতি বউ ঘরের ভিতর মশায়। খবরদার!

দৃক্‌পাত না করে জ্বলন্ত কাড়ু পূর্ণ চালের গায়ে ধরে দাঁড়াল।

বাবা রে! আর্তনাদ করে সে আছড়ে পড়ে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঈশান সড়কি মেরেছে তার পিঠে।

দাউ-দাউ করে ঘর জ্বলে উঠেছে। দরজা খুলে ছুটে বেরুতেই গোলার ধারের সেই কুড়াল দিয়ে কে ঈশানের মাথায় বাড়ি দিল। রক্তস্রোত বইল। আর কিছু তার মনে পড়ে না।

গ্রামের এই বিদ্রোহের খবর কাগজে নিশ্চয়ই আপনারা পড়েছেন: ঈশানকে মেরেছিল, তা নয়—ঈশান কনেস্টবলকে সড়কি মেরেছিল, সেই খবর। তার ফলেই নাকি থানাওয়ালারা গ্রাম জ্বালাতে বাধ্য হয়।

ভোরবেলা ঈশানের একবার একটু জ্ঞান ফিরেছিল। পাড়ার মেয়ে-পুরুষ তার উঠানে। অশোকবাবুরা রাত থাকতেই বিদায় হয়েছেন। ঘরের মটকায় শত-শিখায় আগুন জ্বলছে। গোলার ধারে উয়া-উয়া করে কাঁদছে সদ্যোজাত এক শিশু—জলধরের ছোট ভাই। কুসুম একটু সামলেছে, ঈশানকে চোখ মেলতে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। কচি ছেলের কান্না ডুবে গেল মায়ের কান্নায়। *প্রাণ ভরে কাঁদুক কুসুম, আজকে কান্না ঠেকানোর দরকার নেই,* জলধরের জন্য জমানো কান্না আর ঈশানের জন্য কান্না একসঙ্গে মিলিয়ে সে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে ক্রমশ ঝিমিয়ে এল, কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এল। দুর্বল শরীরে সম্বিৎ হারাল আবার। এদিক-ওদিক বার-কয়েক চেয়ে ঈশান চোখ বুজেছে। রক্তাক্ত বীভৎস মুখে হাসির আভা। আর কি— নূতন ছেলে জন্মেছে রাত্রে—কুড়ালের ঘায়ে যখন সে অচেতন ছিল সেই সময়। পোড়া-ঘরের আগুন লাল আভা ফেলছে শিশুর ললাটে। ঘর পুড়িয়েছে, কিন্তু ঘরের ভিটের নিচে নির্বিঘ্নে রয়েছে ওদের খোরাকি ধান। জলধর গেছে, ঈশানও গেল—বেঁচে রইল নবজাতক। নিস্পন্দ কুসুম। ছেলের কান্না আবার প্রখর হয়ে কানে ঢুকছে, একতারার মতো বাজছে যেন ঈশানের আচ্ছন্ন মনের উপর। উয়া-উয়া-উয়া! শোকের কান্না নয়, জন্ম-পরিগ্রহণের সুখের কান্না।

এই ছেলে বড় হবে, দিল্লি বিজয় করবে। দিল্লি কত দূর?

দিল্লি অনেক দূর

জেল থেকে অজয় শৈলিকে চিঠি দিয়েছিল। পনেরোই স্বাধীনতা-দিবস, তার আগে ছাড় পেয়ে যাব। গাঁয়ে থাকব ঐদিনটা, ওখানে পতাকা তুলব।

মোক্ষদা অজয়ের মামার বাড়ির পুরাণো ঝি। মামারা পৃথক হয়ে ভায়ে ভায়ে তুমুল ঝগড়া বাধালেন; মোক্ষদারও শরীর অপটু হয়ে পড়ল। সেই সময় মা তাকে নিয়ে এসেছিলেন, সঙ্গে একফোঁটা মেয়ে ঐ শৈলি। তারপর মোক্ষদা মারা গেল, শৈলি বরাবর অজয়ের মার কাছে থেকে মানুষ।

মোক্ষদা এমন ছিল, মেয়েটা হল বিষম বজ্জাত। আস্কারা দিয়ে মা তার মাথাটি খেয়েছিলেন। ঝিয়ের মেয়ে, করবেও ঝি-গিরি—কিন্তু মন-মেজাজ সে রকমের নয়। কাজ কিছু করবে না, কেবল ঝগড়া করে বেড়াবে—আর মোড়লি করবে বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর।

বাড়িতে তখন তিনটে দোওয়া-গাই আর দুটো বলদ। পবন গরুর কাজ করে। সে নালিশ করল, শৈলিকে গোবরের মশাল তৈরি করতে বলা হয়েছিল, সে তা কানে নিল না; তাস খেলছে কাঁঠালতলায় বসে। মায়ের নাম করে বলতে উল্টে সে লাথি দেখিয়েছে পবনকে।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে মা ডাকতে লাগলেন, শৈলি, শৈলি—। সাড়া নেই। মা তখন অজয়কে পাঠালেন, তুই যা তো। গিয়ে বল, আমি ডাকছি।

অজয় ফিরে এসে বলল, কানেই নিল না মা, ছক্কা করবে--সেই ভাবনায় মশগুল।

অগ্নিশর্মা হয়ে মা বললেন, চুলের মুঠো ধরে নিয়ে আয় হারামজাদিকে টানতে টানতে।

একটু পরেই কোলাহল। তীরের মতো ছুটে এল শৈলি। মায়ের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখ তো মা, দাদা চুলের মুঠি ধরতে আসছে।

মা বললেন, আমি বলেছি। বড্ড অবাধ্য হচ্ছিস দিন দিন। তাস খেলছিলি এই অসময়ে?

কিন্তু বয়ে গেছে তার মায়ের কথায় কান দিতে। অগ্নিদৃষ্টিতে সে পবনের দিকে তাকিয়ে। বিজয়ীর মতো হাসছিল পবন। হঠাৎ ফাঁক বুঝে এগিয়ে তার কাছে গিয়ে—

থুঃ থুঃ—

থুতু দিল পবনের গায়ে। দিয়েই আবার মায়ের পিঠের আড়ালে এল।

পবন বলে, এই দেখ, দেখ মা—থুতু দিয়েছে।

বড্ড বাড় বেড়েছে। তোমার হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় করব, তখন বুঝতে পারবে মেয়ে।

শৈলি একেবারে গুঁটিসুঁটি হয়ে মায়ের পিছনে লুকিয়ে আছে। মা বললেন, তুই গা ধুয়ে আয় পবন। আমি দেখে নেব ওকে।

শৈলির দিকে চেয়ে তার ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন মা, আর রাগ করে থাকা চলল না।

এর পর বড় হয়ে শৈলি শান্ত হয়েছে, মারামারিটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু শত্রুতা সেই রকমই আছে পবনের সঙ্গে। যখন তখন পবনের নামে লাগায় মায়ের কাছে। তক্কে তক্কে থাকে—কাজের মধ্যে এক মিনিট বসে যদি কলকে ধরিয়েছে, আর রক্ষে নেই—মায়ের হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে এনে দেখাবে। অতিষ্ঠ করে তুলল পবনকে।

মাঘের মাঝামাঝি আবাদ থেকে ধানের নৌকা আসত। তখন দুটো তিনটে দিন খুব কাজ পড়ে যেত অজয়দের বাড়ি। লোকজন ডেকে খালের ঘাট থেকে উঠানে ধান নিয়ে আসা, ধান ঝাড়া, পালি মেপে ধান তোলা গোলার ভিতর। মা একদিন বুঝি বলেছিলেন পবনকে সকাল সকাল ডেকে তুলে দিতে—

ব্যস, ঐ হল কাল। সেই থেকে ভোর না হতেই শৈলি পবনের ঘরের দরজায় হানা দেয়। ধান তোলবার কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু রাত থাকতে তাকে ডেকে তুলে দেবার ব্যবস্থা কায়েমি হয়ে রইল। পবন বাইরের ঘরে শোয়; তাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে—এই সুখে শৈলি শীতের শেষ রাত্রে আঁচল মাত্র গায়ে দিয়ে উঠান পার হয়ে অত দূর চলে যায়, একটা দিন ব্যতিক্রম হয় না।

পবন অজয়কে বলল, আমি চাকরি ছেড়ে দেবো।

অজয় বলল, মাকে বলব। সত্যিই তো—কি দরকার সাত সকালে রোজ রোজ ডেকে তোলবার?

পবন বলে, মার বয়ে গেছে। মা কি এখন ডাকতে বলেন? এসব করছে মাতব্বরি করা যার স্বভাব। মা ওকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন ভাল, নয়তো ওর শাসনে কক্ষণো আমি থাকব না বাবু!

শৈলি শুনে বলে, যাক না যেখানে পারে। কাজের মধ্যে দুই, খাই আর আর শুই। ও না থাকলে বাড়ি আমাদের বুঝি অন্ধকার হয়ে যাবে? তুমি জবাব দিয়ে দাও মা, যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক। পাঁচ টাকা মাইনে বাঁচবে, দু-বেলায় পাঁচপো চালের ভাত বেঁচে যাবে।

. গলা খাটো করে বলবার মানুষ নয় শৈলি। পবন বলে, শুনলে তো মা? উড়ে এসে জুড়ে বসেছে দেখ কি রকম! আমাদের বাড়ি···বাড়িটা অবধি যেন ওর হয়ে গেছে!

মা হাসতে হাসতে চলে গেলেন। শৈলিও হাসে।

হিংসে হচ্ছে? আচ্ছা, তুমি যেদিন বাড়ি করবে, সেইটেকে না হয় বলা যাবে আমাদের বাড়ি।

পবন বলে, কি বললি শৈলি?

বলা কথা আমি দু-বার বলি নে। কালা যারা, শুনতে পায় না—কানা যারা, দেখতে পায় না।

পুলকে ডগমগ হয়ে পবন বলে, ঘর একটা বাঁধতে হয় তা হলে!

হঠাৎ আবার রূঢ় হল শৈলি। বলে, পাঁচ টাকা মাইনেয় ঘর বাঁধা যায় না। ঘর বাঁধতে কোনদিন হবে না তোমার।

এ কথাবার্তা অজয় জানে। তার পড়ার ঘরের পাশেই হচ্ছিল এই সব। পর দিনই পবন কাজ ছেড়ে দিল, মার কাছে গিয়ে সসঙ্কোচে ইচ্ছাটা ব্যক্ত করল।

মা বললেন, কোথায় যাচ্ছিস? কত দেবে তারা?

জিভ কেটে পবন বলল, কোথাও যাব না মা, এমন যত্ন আর কোথা পাব? ছেলে হয়ে আছি, চাকরগিরি করছি আপনার সংসারে বুঝবার জো নেই।

মা বললেন, তবে কি করবি?

ব্যবসা করব।

পুঁজি?

পুঁজি আর কে দিচ্ছে মা? এক মাস আঠারো দিনের মাইনে পাব, ঐ দিয়ে পান-সুপারি কিনে ফিরি করে বেড়াব ভাবছি।

মা চুপ করে ভাবলেন একটুখানি। তারপর বললেন, বেশ। মাইনে এক মাস আঠারো দিনের নয়—দু-মাসেরই পুরোপুরি। তার উপর আমি আরও কুড়ি টাকা দেবো। ব্যবসা ভাল চলে তো শোধ দিবি, নয় তো কিছুই দিতে হবে না।

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে পবন মার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করল। আড়ালে গিয়ে শৈলি ধমক দেয় পবনকে। ভিক্ষের টাকা হাত পেতে নিতে লজ্জা করবে না?

পবন হতভম্ব হয়ে গেল। মা ভালবেসে দিতে চাচ্ছেন—সেই সম্পর্কে এমন কথাও বেরুল শৈলির মুখ দিয়ে? বলে, ভিক্ষে দেখলি কোথায়? এ তো কর্জ নেওয়া। সুসময় এলে শোধ করে দেবো।

শৈলি বলে, বেশ! কর্জ নেবে তো আমার কাছ থেকে নিও, সুদ দিতে হবে টাকায় এক পয়সা। কুড়ি টাকা আমি দেবো, সুদের পাঁচ আনা মাসে মাসে তুমি শোধ করে যেও।

অনেক টাকা হয়েছে তোর, টাকা খাটাবার দরকার? পবন গালভরা হাসি হাসল। বলে, এই কথাটা সোজা করে বললেই হত। কিন্তু মার টাকা ভিক্ষে বলে ঠেস দিলি তুই কোন্ মুখে? জিভে আটকাল না?

গঞ্জ থেকে ব্যবসার মালপত্র নিয়ে এল, সেদিনের কথা অজয়ের মনে পড়ে। পান-সুপারি, দোক্তা তামাক, ঘুনসি, কাচের চুড়ি, আলতা-পাউডার। দোকানদার একটা জিনিস ছিল মুক্তা-বসানো—মায়ের সেই গয়না বিক্রি করে শৈলি পবনকে টাকা কর্জ দিয়েছে। মালপত্র শৈলি নিজে ডালায় সাজিয়ে দিতে বসল। একবার এক ভাবে তোলে, আবার মাটিতে নামায়। কিছুতে যেন মনোমত হয় না। অজয় হবে প্রথম খরিদ্দার—তার কিনবার মতো জিনিস কিছু নেই, দু-পয়সার পান-সুপারিই কিনল অগত্যা। কাঁচা সুপারি চিবিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় আর কি!

অপার সে কি নিদারুণ পরিশ্রম পবনের! আর কারো ডেকে দিতে হয় না—সকাল হতে না হতে ডালা মাথায় বেরোয়, এ-গ্রামে ও-গ্রামে বাড়ি বাড়ি ফিরি করে বেড়ায়। ফেরে বিকালবেলা। দুটো নাকে-মুখে গুঁজে আবার তখনই রওনা হয়ে পড়ে হাট করতে। তিন-চার ক্রোশ দূর অবধি হাট করতে যায়। চেহারা আধখানা হয়ে গেছে, কিন্তু মুখের উপর হাসি লেগে আছে। এমন আগে ছিল না তো এ পবন!

অজয় জিজ্ঞাসা করে, কি রকম হচ্ছে বল তো?

পবন বলে, হবে বই কি, নিশ্চয় হবে। বছরের মধ্যে দেখতে পাবেন, দোকান ফেঁদে বসেছি, দুয়োর দুয়োর ঘুরে বেড়াতে হবে না। শৈলি বুদ্ধিটা দিয়েছিল মন্দ নয়। পরের বাড়ি খেটে কিছু হয় না—এতে উন্নতির আশা আছে।

কাজ ছেড়ে দেবার পরও পবন অজয়দের সেই বাইরের ঘরে আছে, খাওয়া-দাওয়াটা কেবল আলাদা করে। মা বলেছিলেন, এ হাঙ্গামার গরজ কি? আগে ভাল করে নিজের পায়ে দাঁড়া, তখন রান্না-বান্না করে খাস। পবন রাজি হল না শৈলিরই প্ররোচনায় সম্ভবত। ফিরে আসতে তার বিকাল হয়ে যায় বলে শৈলিই ফাঁকমতো দুপুরের রান্নাটা করে রেখে আসে।

বি. এ. পড়বার জন্য অজয় এইবার কলকাতায় গিয়ে থাকবে। মা বললেন, জষ্টিতেই শৈলির বিয়ে দিই। বোনের বিয়ে অজয় দেখবে না, সে কখনো হতে

পারে না। শৈলিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, আর তো মেয়ে নেই আমার—শখ মিটিয়ে এই বিয়েয় আমোদ-আহ্লাদ করব।

শৈলি প্রতিবাদ করে, না মা, গরিবের বিয়েয় আমোদ-আহ্লাদ করলে নিন্দে করবে যে লোকে!

করে করবে আমার নিন্দে। তুই বিয়ের কনে—একেবারে মুখটি বুজে থাকবি। কোন রকম পাকামি করবি নে।

শৈলি বলে, তা হলে মা দাদার ছেলেবয়সের যে পুতুলগুলো আছে, তারই একটার বিয়ে দিয়ে দাও। যত খুশি আমোদ-আহ্লাদ কোরো। পুতুল কথা কইতে পারে না, মুখ বুজে থাকবে।

অজয়ের মনে পড়ে, বিয়ের পর পবন আর শৈলি যেদিন তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মা বলেছিলেন, কি দরকার তোদের নতুন ঘর বাঁধবার? খামোকা কতকগুলো পয়সা খরচ করা। আলাদা থাকতে চাস, তাই না হয় থাকবি। তিন-তিনটে ঘর পড়ে রয়েছে, ঐখানে সংসার পাত। তোদের ওদিকে ফিরেও তাকাব না আমরা।

শৈলি ঘাড় নাড়ল। না মা, তোমার বাড়ির আনাচে-কানাচে কেন আমরা থাকতে যাব?

অকারণে আঘাত করতে আর কাটা-কাটা কথা বলতে শৈলির জুড়ি নেই। মার গলাটা ধরে এল বুঝি। ম্লান হেসে বললেন, আনাচ-কানাচ হল কি করে শুনি? বাইরের ঘর—তোরাই সামনে রইলি, আমরা বরঞ্চ পিছনে পড়ে গেলাম।

তাই বা থাকতে যাবো কেন মা? তার চেয়ে তোমাদের বড়-বাগানের এক পাশ থেকে কাঠা আষ্টেক জমি দাও আমাদের। সেখানে নতুন ঘর বাঁধি।

মজা নদীর ধারে বড়-বাগান। এককালে প্রচুর আম-কাঁঠাল গাছ ছিল শোনা যায়, এখন বাবলা নাটা সুঁইকাঁটা আর কাঁটাঝিটকের জঙ্গলে জায়গাটা দুর্গম হয়ে আছে। মার মুখের কথায় হল না—দস্তুরমতো দলিল করে দিতে হল তাদের, দেড় টাকা বার্ষিক খাজনা। সাপ আর বুনো-শুয়োরের ভয়ে ওদিকে পা ছোঁয়াত না কেউ, সেই বাগান কেটে পবন সেখানে ঘর তুলছে।

অজয় পরমোৎসাহে ওদের ঘর বাঁধা দেখতে যেত। দেখে এসে মায়ের সঙ্গে গল্প করত। ঘর ছাওয়া, ঘরের মাটি তোলা, বেড়া দেওয়া—পবন আর শৈলি কেবল এই দুটি প্রাণী মিলে সমস্ত কাজ করছে। যেদিন তাদের টুকিটাকি জিনিসপত্র গাঁটরি বেঁধে নিয়ে মাকে প্রণাম করল, মা শৈলিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

কসাড় জঙ্গল—কেমন করে থাকবি ওখানে বল্ তো ?

অজয় বলল, কাঁদছ তুমি মা—

মেয়ে বনবাসে পাঠাচ্ছি, কাঁদব না ?

আগে অনেক সময় অজয়ের রাগ হয়েছে শৈলির কথাবার্তার ধরনে। ইতিমধ্যে বার দুয়েক জেল ঘুরে এসে এখন তার মনের ভাব অন্য রকম। বড় ভাল লাগে, দারিদ্র্যের সামনে ওদের মুখের উৎসাহ-দীপ্তি, নিজেদের চেষ্টায় ঘর বেঁধে বসত করবার এই আগ্রহ। অজয় বলল, আমাদের পথেও তো মা কত বিপদ! নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাচ্ছি আমরাও, সাপ-শূয়োরের চেয়ে কত ভয়ানক শত্রু ঘাপটি মেরে আছে আমাদের চারিদিকে! ছেলের বেলা আপত্তি করো না, আর মেয়ের বেলা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ ?

শৈলি বলে, তাই দেখ দাদা। আমরা তবু সামনেই রইলাম, তোমায় দু-মাসে ছ-মাসে একবার হয়তো চোখের দেখাও দেখতে পাবেন না।

এর অনেকদিন পরে অজয় একবার গ্রামে এসেছিল। তখন মা মারা গেছেন, অজয়দের ঘর-বাড়ি খসে পড়ছে। জ্ঞাতি সম্পর্কীয় কাকার বাড়ি গিয়ে উঠবে এই মতলব ছিল। কিন্তু নদীর ঘাটে নৌকা লাগতেই শৈলির সঙ্গে দেখা—সে স্নান করতে আসছিল। নাছোড়বান্দা একেবারে—বলে, না দাদা, কাকা মশায়ের বাড়ি যাওয়া কখনো হবে না, গালিগালাজ করেন। তুমি স্বদেশি করে বেড়াও বলে মাকে পর্যন্ত দেখতে যান নি শেষ সময়।

ওদের বাড়ি নিয়ে তুলল। বড়-বাগানের প্রান্তে ঝিকমিক করছে খড়ে-ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানা। তকতকে উঠান—এমন পরিচ্ছন্ন যে সিঁদুর পড়লে তুলে

নেওয়া যায়। কিন্তু বাড়িতে পিতল-কাঁসার বাসন নেই—মাটির হাঁড়ি-কড়াই শামুক-মালসা। রোজ কলাপাতা কেটে এনে ভাত খায়—গ্রামে দুর্লভ নয় এ জিনিসটা। আর-দেখল, শৈলির দু-হাতে দু-গাছা মাত্র শাঁখা।

পবনকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন চলছে তোমার দোকান?

পবন বলে, না বাবু হয়ে ওঠে নি এখনও। হয়ে যাবে, দেরি নেই—চড়কের বাজার লাগবার আগেই দোকান তুলব। জোগাড় হয়ে এসেছে।

এখনো সে তেমনি ফিরি করে বেড়ায়, বর্ষায় এক হাঁটু কাদা ভেঙে আর শীতকালে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে রাত দুপুরে হাট করে বাড়ি ফেরে। এক বছরের ভিতর দোকান হবে ভেবেছিল, বছর তিনেক কেটে গেছে—তা হোক, এইবার আর অন্যথা হবে না। শৈলি কি যত্ন করে যে খাওয়াত অজয়ের সামনে বসে! উপকরণ সামান্য—ভাত, কচুপাতার ঘণ্ট, হয়তো বা কাঁচা-তেঁতুলের ঝোল তার উপর। সঙ্কোচ নেই সে জন্য। বরঞ্চ শৈলি যেন রাণী হয়ে রাজ্যপাট করছে, আনন্দ উপচে পড়ছে তার চলনে-বলনে।

অজয় একটা-দুটো দিন থাকবে ভেবেছিল, কিন্তু পুরো সপ্তাহ কাটিয়ে গেল এদের বাড়ি। বড় ভাল লাগল। সচ্ছল সংসার গড়ে তুলবেই এরা নিজেদের পরিশ্রমে, গ্রামের কারও অনুগ্রহ চায় না। অজয়ের মনে হল, স্বাধীনতার জন্য লড়াই—এদেরই এমনি সব গৃহস্থালী সর্ববাধা-মুক্ত হবে বলেই তো!

জেলের মধ্যে অজয়ের অনেক দিন মনে পড়েছে শৈলিদের কথা। পবনের দোকান তোলা হয়েছে নিশ্চয় এতদিনে। ছোট শিশু হেসে নেচে আনন্দময় করছে তাদের জঙ্গল-কাটা বাড়ি। কাঁসার থালায় দুধ-মাছ দিয়ে ওরা ভাত খায়, ছেলেপুলের মুখে আদর করে দুধ-মাছ তুলে দেয়। ছাড়া পেলে আবার কয়েকটা দিন অজয় বিশ্রাম নিয়ে আসবে ওদের সংসারে। পনেরোই আগস্টের আগে ছেড়ে দেবে খবর পেয়ে অজয় শৈলিকে চিঠি লিখল, স্বাধীন-পতাকার নিচে তুই, তোর ছেলেপুলে, পবন আর আমি একসঙ্গে দাঁড়াব। আমার মায়ের আত্মা খুশি হবে।

আর ভেবেছিল, তৃপ্তিকেও চিঠি দেবে একখানা। কিন্তু না, উচিত হবে

না। বারিদ মুখুজ্জের সন্দেহ জেড়ে যাবে মেয়ের উপর। উপকারী জনকে বিপদে ফেলা উচিত নয়। এবার জেলে আসবার আগে সে তৃপ্তির আশ্রয়ে ছিল।

রাস্তা দিয়ে যখন মিছিল যেত, জানলা বন্ধ করে দিত তৃপ্তি। আশ্চর্য মেয়ে, কৌতূহলও হয় না একনজর তাকিয়ে দেখবার। বারিদকে বলত, কি আবার দেখব বাবা? যারা কাজ করে না, তারাই চেঁচায়। চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে দেয় আর দশজনের। আমি বাবা দোতলার পিছন দিকে পড়ার ঘর করব। রাস্তার এদিকে পড়াশুনো হয় না।

অজয় সেই সময়টা বিষম বিপন্ন। থাকবার জায়গা খুঁজছে। কলকাতা ছেড়ে যাবারও উপায় নেই। অনেক কাজ।

তৃপ্তি থার্ড ইয়ারের বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল হয়ে এল। মুখ শুকনো করে বাপের সামনে দাঁড়াল।

বারিদ বললেন, তাই তো! অঙ্ক ছেড়ে বরঞ্চ আর কিছু নিয়ে নে তার বদলে।

না বাবা, এতদিন পড়ে এসে এখন ছেড়ে দেবো কেন? মাস্টার রাখতে হবে। আমার চেনা-জানা একজন আছেন—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ম্যাথামেটিকসে।

কত দর হাঁকবে ঠিক কি?

উঁহু, দর হাঁকবে না—

টাকা নেবে না? অঞ্জলি দেবী সন্দেহদৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে।

কিছু হাত-খরচ দিলেই হবে। থাকার জায়গা পাচ্ছেন না ভদ্রলোক—কলকাতায় একটু জুতমতো জায়গা পেলে বর্তে যান।

তৃপ্তি চলে গেলে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হয়। অঞ্জলি বলেন, বিনা মাইনেয় পড়াবে, আমার সন্দেহ হচ্ছে।

বারিদ হেসে বলেন, তা হলেও তো বাড়িতে নিয়ে আসা উচিত। মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে—এটাকে চোখের সামনে রেখে ভাল করে বাজিয়ে দেখা যাক।

কিন্তু অজয় আসবার পর অঞ্জলি দেবী মুগ্ধ হয়ে গেলেন ক-দিনের মধ্যে। সত্যি ভাল ছেলেটি, ঠাণ্ডা মেজাজের—কোন রকম বেয়াড়াপনা নেই।

বারিদ বললেন, স্বাস্থ্য চমৎকার, চেহারাও ভাল। খোঁজ খবর নাও দিকি বাড়ি কোথায়, কি জাত, কেমন বংশ—

অঞ্জলি দেবী হেসে বললেন, সে সব কিচ্ছু নয়। মেয়েমানুষ আমরা—ভাব দেখে বুঝতে পারি। একেবারে পরমহংস গোছের ছেলে।

বারিদের অফিস-ঘরের পাশে অজয়ের থাকবার ঘর। পাবলিক প্রসিকিউটার—বাইরের মক্কেলও আছে, যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, ফাইল পরিবৃত হয়ে থাকেন। আর অজয়ের মতো ঘরকুণো ছেলেও দেখা যায় না—সব সময়ে একটা না একটা বই মুখে দিয়ে বসে আছে। বই ছাড়া আর কোন-কিছুর সম্বন্ধে মাথাব্যথা নেই জগতের মধ্যে। বারিদ মনে মনে হাসেন। তাঁদের মধ্যে কত না জল্পনা হয়েছিল এর এসে পৌঁছানোর আগে!

সকালবেলা তৃপ্তিকে পড়ানোর সময়, তখন একবার অজয়কে উপরে যেতে হয় তৃপ্তির পড়ার ঘরে। আড়াল থেকে অঞ্জলির খরদৃষ্টি থাকে। দেখে দেখে অবশেষে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। না—এমন সৎ ছেলের কাছ থেকে কোন আশঙ্কার হেতু নেই মেয়ের সম্বন্ধে।

অজয় প্রথম দিন তৃপ্তিকে বলেছিল, এখানে এনে তুললে?

তৃপ্তি বলল, সারা শহরের মধ্যে এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কোথাও নেই। বড্ড পুলিশের যাতায়াত—

তারা বাবার ঘরে আসে নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে। পাশের ঘরে উঁকি দিতে যাবে না।

তা যেন হল। কিন্তু অঙ্কের কিছুই যে আমি জানি নে। তোমার এসব বই আগে কখনো চোখে দেখি নি।

কি করা যাবে! অঙ্কেই যে ফেল করে বসলাম। সংস্কৃতে হলে সংস্কৃতের পণ্ডিত হতে হত আপনাকে।

কিন্তু সামনের পরীক্ষায় একেবারে শূন্য পাবে।

খুব ভাল নম্বর পাব দেখবেন সামনের পরীক্ষায়—মাস্টার মশায়ের পড়ানোর গুণে।

সত্যিই সে ভাল নম্বর পেল। কলেজের সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে অঙ্কে দ্বিতীয় স্থান হল তার।

পুলকিত বারিদ অজয়ের ঘরে এসে সেকহ্যাণ্ড করলেন। অঞ্জলি নিজের হাতে খাবার নিয়ে এলেন। প্রথম সেই কথা বললেন, একটাও বাজারের জিনিস নয়। সারা দুপুর বসে বসে তৈরি করেছি, ঠাকুরের হাতে দিতে ভরসা করি নি। সবগুলো খেয়ে ফেলতে হবে বাবা।

অজয় আশ্চর্য হয়ে তৃপ্তিকে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার বলো তো?

তৃপ্তি বলে, বাবা যা বলে গেলেন, একটা কথাও মিথ্যে নয়। কৃতিত্ব সমস্ত আপনার।

সেবারে অঙ্কে তবে ইচ্ছে করে ফেল হয়েছিলে নাকি?

না, ইচ্ছে করে পাশ করলাম এবার।

ইচ্ছে করলে সবই পারো দেখছি তুমি।

দেখছেনই তো। বাবা-মার ইচ্ছেয় কেমন ভাল মেয়ে হয়ে আছি, স্বদেশিদের গালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিই। আবার আপনাদের ইচ্ছেয় পার্টি-মীটিঙে গিয়ে বসি কলেজ পালিয়ে।

পুলিশ অজয়কে ধরে ফেলল। যেন শুঁকে শুঁকে এখানে এসে ধরল। বারিদ আর অঞ্জলি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এমন ছেলে এই করতে পারে, জগতের কাউকে আর বিশ্বাস নেই।

তৃপ্তি ভয়ে কেঁদে ফেলে আর কি!

উঃ, পেটে পেটে এত ছিল ভদ্রলোকের! আমাদের আবার গোলমালে ফেলবে না তো বাবা, অমন লোককে আশ্রয় দিয়েছিলাম বলে?

তখন অজয়ের উদ্দেশে গালমন্দ স্থগিত রেখে বারিদ মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হলেন।

ভয় নেই, অত তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? আর কেউ হলে রক্ষে ছিল না, জড়িয়ে দিত। আমাকে চেনে সবাই, আমরা এ কাজের কাজি পুলিশ বিশ্বাস করবে না।

তৃপ্তি তবু ঠাণ্ডা হয় না।

বিশ্বাসঘাতক! দেখো বাবা, ছাড়া না পায় যেন কিছুতে। সবাই তো তোমার বন্ধুবান্ধব—বলে দিও, কি রকম আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলেছে।

হেসে বারিদ বলেন, আমায় কিছু করতে হবে না মা। যে-সব চার্জ তার নামে, শুনেই গা শিউরে ওঠে। আচ্ছা অভিনয় করতে পারে ওরা কিন্তু।

তৃপ্তি বলে, কি জানি, কেমন করে মনের ভাব চেপে থাকে—আমি তো ভেবে পাই নে। আমার তো হাসি পেলেই হেসে ফেলি, কান্না পেলে কাঁদি।

একদিন বারিদ কোর্ট থেকে ফিরে এসে বললেন, তুই যে বলেছিলি অঙ্কে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট ?

তবে ?

দূর! বি. এ. পড়তে পড়তে ইস্তফা দিয়েছিল। তা-ও পিওর আর্টস পড়ত, ক্যালকুলাসের 'ক'-ও জানে না।

অঞ্জলি বললেন, পড়াত কিন্তু অতি চমৎকার। তোমার ফেল-হওয়া মেয়ের অঙ্কের জন্য ফার্স্ট হওয়া ফসকে গেছে। যাই বলো—আমার মনে হয়, মিছামিছি ওকে ধরেছে। গোবেচারা ভালমানুষ—ও যে এতসব করতে পারে, চোখে দেখলেও বিশ্বাস করি নে।

জেলের গেটে লোকারণ্য। একা অজয়ের জন্য নয়, অনেকেই বেরুচ্ছে আজ, জেলের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। জেল-বিভাগের নূতন মন্ত্রী অজয়দেরই একজন—তাদের দাদা স্থানীয়। গোটা বারো বছর জেলে বসবাস করে এসেছেন বাইশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে। এবার পাশা উল্টে গেল। বড় আসনে বসে অধম কনিষ্ঠদের কথা মন্ত্রী মশা[illegible] ভুলে যান নি এখনো।

বেরুচ্ছে, পার্টির ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা দূরে—তৃপ্তি নয় ? মেয়ের সঙ্গে বারিদ মুখুজ্জেও মোটর নিয়ে এসেছেন।

ছেলেরা মালা পরাল। বারিদ তাদের মধ্যে এগিয়ে এসে বললেন, হল আপনাদের ? এবারে ছেড়ে দিন। আর যা কাজকর্ম থাকে, বিকেলে আমার বাড়ি

যাবেন আপনারা—সেখানে গিয়ে হবে। যাবেন দয়া করে, চায়ের নিমন্ত্রণ রইল আপনাদের সকলের। আজকের আনন্দের দিনে একজন কেউ বাদ না থাকেন।

বারিদ মুখুজ্জে পার্টির ছেলেদের বললেন এই কথা, তাদের নিমন্ত্রণ করলেন। অজয় চোখ কচলায়, স্বপ্ন দেখছে না সে তো?

কোন কথা অজয়কে বলতে দিল না, তৃপ্তি হাত ধরে বিশাল মোটরের গর্তে নিয়ে তুলল। হু-হু করে ছুটল গাড়ি।

মৃদু কণ্ঠে তৃপ্তিকে অজয় জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি?

বারিদের কানে গেল। তিনি বললেন, কাল স্বাধীনতা-দিবস। আমার বাড়ি পতাকা তোলা হবে। আলো আর উৎসবেরও আয়োজন করেছি। এক সময়ে আপনার সামান্য কিছু কাজে লাগবার ভাগ্য হয়েছিল। সেই সুবাদে নিবেদন জানাচ্ছি, পতাকা আপনাকেই তুলতে হবে। আপনার কথা পেলে খবরটা কাগজে পাঠিয়ে দিই।

এমন করে বলেছেন যে, 'না' বলতে লজ্জা করে। তবু বলতেই হল—শৈলিকে চিঠি লেখা হয়েছে, তার যেমন কাণ্ড—হয়তো গ্রামের অর্ধেক মানুষ জুটিয়ে এনে জোয়ারের সময় নদীর ঘাটে অপেক্ষা করে বসে থাকবে।

তৃপ্তি বলে, পরশু যাবেন কালকের দিনটা না গিয়ে। গেঁয়ো ব্যাপার—কি-ই বা হবে সেখানে, ক-জনে দেখবে! একদিন হলেই হল। কাল বা পরশু সমান তাদের কাছে।

অজয় বলে, না তৃপ্তি, বাধা দিও না। তোমাদের অনেক আয়োজন, অনেক দেশ-বিখ্যাত মানুষ পাবে তোমাদের অনুষ্ঠানে। তাদের ঘরে স্বাধীনতার খবর পৌঁছে দেবার জন্য মন আমার ছটফট করছে। গাড়িটা রাখতে বলো একটু—

রাস্তা জুড়ে বড় বড় গেট তৈরি হচ্ছে। ইলেকট্রিক-মিস্ত্রিরা মই আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটোছুটি করছে আলোক-সজ্জার ব্যবস্থায়। আগামী দিনের উৎসবের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। পতাকা বিক্রির জন্য অস্থায়ী অনেক দোকান খুলেছে পথের ধারে। দোকানদারদের মরশুম পড়েছে। অজয় একটা পতাকা কিনে নিয়ে এল।

অঞ্জলি দেবী রাস্তা অবধি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন, এসো বাবা, এসো—

তৃপ্তি অজয়ের কানের কাছে মুখ এনে বলে, কি আদর দেখুন এবার এ-বাড়িতে!

অজয় বলে, সে আমলে হোমরা-চোমরা সাহেবসুবোর যেমন ছিল, অবিকল সেই রকম।

তৃপ্তি বলে, মাকে বলেছি—ষড়যন্ত্র করে আপনাকে বাড়ি এনে তুলেছিলাম, সেই সব গল্প। বাবাকে আজ বলব। খুব হাসাহাসি হবে দেখবেন।

তৃপ্তি এক মুহূর্ত কাছছাড়া হয় না অজয়ের। কতদিনের জমানো কথা, কত হাসি-রহস্য! বলে, জানেন—এক মজা হয়েছিল। এক ছোকরা আই. সি. এস. আনাগোনা করছিল কিছুদিন ধরে। একদিন জুতোর হিলে কাদা ছিটকে তার স্যুট নষ্ট করে দিই—সেই থেকে পিছু ছেড়েছে।

ভুল করেছ কিন্তু তৃপ্তি। আরামে থাকতে পারতে।

তৃপ্তি বলে, ওদের দিন ফুরিয়েছে।

অজয় বলল, সরকারি বাড়িতে ইউনিয়ন-জ্যাকের বদলে কাল তেরঙা পতাকা উঠবে। গতিক বুঝে তাড়াতাড়ি সবাই ভোল বদলাচ্ছে। রাগ কোরো না—তোমাদের বাড়িও তার ব্যতিক্রম নয়। এবারের লড়াই এই এদেরই সঙ্গে। আগে একটু সুবিধা ছিল, গায়ের রঙে জাত ধরা যেত। এবারে সেটা হবে না।

গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগল। কেউ আসে নি, কাকস্য পরিবেদনা। চিঠি পায় নি নাকি শৈলি?

শৈলিদের বাড়ির দিকে চলল। এত পথ গেল, একটা মানুষ দেখতে পায় না। শঙ্খধ্বনি নেই, পনেরোই আগস্ট—এই স্মরণীয় দিনটির চিহ্ন নেই কোন দিকে। কোথায় ওদিকে ক্ষারে-সেদ্ধ কাপড় আছড়াচ্ছে পাটের উপর—তার আওয়াজ আসছে। ক-জন চাষা পাশাপাশি ক্ষেতে নিড়ানি দিচ্ছে, ধানবনের আড়ালে তাদের মাথার টোকা দেখা যাচ্ছে। তৃপ্তি

বলেছিল ঠিক, আজকে না এসে যে-কোন একদিন এলেই চলত এখানে। এ পতাকার কোন মহিমা নেই এদের কাছে।

শৈলি!

বড়-বাগানের জঙ্গল বেড়ে উঠে গ্রাস করতে বসেছে শৈলিদের ঘরটা। উঠান ভাদল্য-ঘাসে এঁটে গেছে। ভাঁট আর আশশ্যাওড়ায় বাড়ি ঢুকবার পথটুকু এমন আচ্ছন্ন যে সন্দেহ হয় মানুষ থাকে না এখানে। পা দিতে আতঙ্ক লাগে। উঠানে এসে উচ্চকণ্ঠে অজয় ডাক দিল, শৈলি!

শৈলি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

চিঠি পাস নি?

পেয়েছিলাম দাদা। জ্বরে কাঁপছি—ঘাটে যাবো একবার ভাবছিলাম। কিন্তু উঠতে পারি নে, যাই কেমন করে?

গ্রামে বলেছিস আজকের উৎসবের কথা?

বলেছি বই কি! তা মনে সুখ নেই কারো। ধান-চালের এই দাম—একবেলা খেয়ে থাকে। তা-ও খেতে হয় না অবিশ্যি—বিষম জ্বরজারি, উপোসই চলে বেশির ভাগ দিন।

এখন নজর পড়ল, ওধারে সুপারি-চারাগু[illegible] নিচে কয়েক টুকরা বাখারি নিয়ে একটি ছেলে খেলা করছে। বাখারিগু[illegible] যেন গরু—গলায় দড়ি বেঁধে টেনে বাঁধছে সুপারিগাছে। নিকষ-কালো গা[illegible] রং, ন্যাংটো একেবারে—গলায় দুটো লোহার মাদুলি। অজয়কে দেখে [illegible] ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়াল। অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

তোর ছেলে?

হাঁ দাদা। গড় কর্ খোকা। তোর মামা হন।

শৈলির ছেলে প্রণাম করতে গেল। অজয় তাকে জড়িয়ে ধরল। হাতে ভাঁজ-করা তেরঙা পতাকা—ছেলেটা লোলুপ চোখে সেদিকে তাকাচ্ছে।

অজয় গভীর কণ্ঠে বলল, অনেক দুঃখের জয়-পতাকা, অনেক রক্তের দাগ

লেগে আছে। তোদেরই জন্যে এনেছি খোকা। এখনই টাঙিয়ে দেবো।

শৈলি চোখ মুছছিল, হঠাৎ সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আজকে তুমি এসেছ। সে থাকলে কত আমোদ করত। দোকান-দোকান করে মারা গেল, কিছু করে যেতে পারল না। অসুখের মধ্যে সব দিন এক ঝিনুক বার্লিও মুখে তুলে দিতে পারি নি দাদা, এক ফোঁটা ওষুধ জোটে নি।

তখন আর হল না—শৈলির পথ্য আর শৈলির ছেলে ও নিজের জন্য চাল কিনতে অজয়কে ছুটতে হল হাটখোলা অবধি। বিকালবেলা শৈলির জ্বর কমেছে, পাড়াটা ঘুরে আবার সে বাড়ি বাড়ি বলে এল। পবিত্র স্বাধীনতা-দিবস—যত তার বুদ্ধিতে কুলায় প্রতি জনকে বুঝিয়ে দিয়ে এল শৈলি। তবু পুরুষমানুষ বড় কেউ এল না। কাজে বেরিয়ে গেছে, নয় তো জ্বরে ধুঁকছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে—উঠবার ক্ষমতা নেই। এল কয়েকটি বউ-মেয়ে আর ছেলেপিলে কতকগুলো। নূতন এক মজা দেখতে এসেছে যেন তারা, কোলাহল করছে—এতবড় মহৎ গম্ভীর অনুষ্ঠান, তা বলে একবিন্দু সমীহ নেই। গাঙের ধার থেকে দীর্ঘ এক তলতাবাঁশ কেটে এনে তার মাথায় পতাকা তোলা হল। অজয়ের দু-চোখ জলে ভরে আসে সতীর্থদের কথা ভেবে—পথের মধ্যে যারা প্রাণ দিয়েছে, আজকের দিনে যারা নেই। কি জানি কেন, তাদের সঙ্গে পবনকেও মনে পড়ল। আর মনে পড়ে আগেকার সেই শৈলিকে। স্বাধীন ঘর বাঁধবার জন্য হাসিমুখে এরা দুঃখের পথে পা বাড়িয়েছিল।

বাতাসে পতাকা উড়ছে, ঝিলমিল করছে বিকালের আলো পড়ে। শৈলির ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। শুধু কচি ছেলেটা বা কেন—সকলের চোখেই বিস্ময় ও কৌতুক। অজয়ের ছেলেমানুষি দেখছে তারা অবহেলা ভরে। পবিত্র পতাকা শুধু এক রঙবেরঙের নেকড়ার ফালি ছাড়া কিছু নয়।

অজয়ের লজ্জা করছে। পতাকা না এনে সাধ্যমতো দু-খানা চারখানা কাপড় কিনে যদি বগলদাবায় করে নিয়ে আসত!

পতাকার নিচে

স্বাধীনতার পতাকা উড়ল ইস্কুলে। মাস্টারমশায়দের কেমন অবাক চাউনি—দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। এতকাল উল্টো রেওয়াজ ছিল। প্রতি বছর ছেলেরাই ইস্কুলের ছাতে পতাকা-তোলা নিয়ে জটলা করত, মাস্টারমশায়রা সুকৌশলে ভেস্তে দিতেন। ওঁদের ভিতরকার দলাদলি এবং পরস্পরের উদ্দেশে নিন্দা ও গালিগালাজ ভুলে যেতেন শুধু এই একটা ব্যাপারেই একটা দিনের জন্য। স্বদেশি ভাবের মানুষ বলে সেক্রেটারির বাইরে নাম আছে। সে নামের কোন রকম হানি না হয়, সেজন্য অত্যন্ত গোপনে হেড-মাস্টারকে তিনি নির্দেশ দিয়ে দিতেন। রঙ্গস্থলে প্রকাশ্যত কোমর বেঁধে দাঁড়াতে দেখা যেত হেড-মাস্টার ও অন্যান্য মাস্টারদের।

প্রবীর বরাবর ভাল ছেলে ছিল। ওঁরা বলতেন, ইস্কুলের সে গৌরব। কিন্তু কলেজে ঢুকে পর পর বার-তিনেক জেল খাটবার পর দেশে গিয়ে দেখে, ইস্কুলের সীমানার মধ্যে প্রবেশ তার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। স্পষ্টাস্পষ্টি কেউ মানা করেন নি—মদন মাস্টার ছাড়া। আর সবাই মুখ কালো করে সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন। মদনের অধিকার আছে প্রবীরকে যা খুশি বলবার, তাঁর কথায় প্রবীর রাগ করতে পারে না। ক্লাসে সব চেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিল সে মদনের। বাড়িতেও তাকে প্রাইভেট পড়িয়েছেন, অকারণে অনেক মারধোর করেছেন। তা সত্ত্বেও মদনের উপর তার গভীর শ্রদ্ধা—বিশেষ করে তাঁর প্রথম জীবনের একটা কাহিনী শোনা অবধি। বড়লোক শ্বশুর [illegible] ভাল চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। দিন-দশেকের মধ্যেই মদন ইস্তফা দিয়ে এলেন—গোলামি কথা তাঁর ধাতে সইবে না। নিজের পরিশ্রমে নিজের

পায়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু সে জেদ বজায় রাখতে পারেন নি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। মদনের শ্যালক রাধাকান্ত নাম-করা অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরির মালিক—শোনা যায়, ঐ ফ্যাক্টরির গোড়াপত্তন মদনের হাতেই। অথচ সমস্ত ছেড়েছুড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ইস্কুল-মাস্টারি নিতে হল টাকার অভাবে। টাকা নইলে সব পরিকল্পনাই অচল। রাধাকান্তর দোষ নেই—তিনি মদনকে বলেছিলেন, কিছু অংশ নিয়ে ঐ ফ্যাক্টরির কাজে লেগে যেতে। কিন্তু মদন ভেবে দেখলেন, তাতে অর্থবানেরই গোলামি করা হবে। অর্থবান আত্মীয়ের অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকার চেয়ে গ্লানিকর আর কিছু নেই। রাধাকান্তর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইস্কুল-মাস্টারি শুরু করলেন তিনি। মাথার উপরে ঈশ্বর ছাড়া কারও অনুগ্রহ তিনি চান না। কিছু টাকা জমিয়ে আবার তিনি ব্যবসায়ে নামবেন। তারপর অনেক কাল কেটেছে, অনেক বয়স হয়ে গেছে। নিজের কিছু হল না—এখন মনে ভাবেন, ছেলেকে দিয়ে আশা মেটাবেন। গোলামি করবেন না বলে জাঁক করেছিলেন—কিন্তু জীবন ভোর কত জনের যে গোলামি করতে হল, তার সীমা-সংখ্যা নেই। ইস্কুলের সেক্রেটারি ও মেম্বারদের তো বটেই, তা ছাড়া আজ অবধি বোধকরি সত্তর আশি বাড়ি প্রাইভেট-ট্যুইশানি করেছেন—পড়ানোর সময় ও প্রণালী নিয়ে তারা প্রায় সকলেই নানা রকম হুকুম ঝাড়ত তাঁকে দশ-পনেরো টাকার কেনা-গোলাম বিবেচনা করে। হেড-মাস্টারের কথায় প্রবীরকে ইস্কুলে ঢুকতে মানা করে দিয়েছিলেন, তার কারণ শুধু গোলামি করা নয়—গোলামি খোয়ানোর ভয়ও ঢুকেছিল মনের মধ্যে। ছেলে-মেয়ের সঙ্গে এক সংসারে যতদিন ছিলেন, তখন বোধ হয় এত দুর্বলতা আসে নি।

যাই হোক, পাশা উলটে গেল। প্রবীর হেন ছোকরাকে আজকে সেক্রেটারি মশায় খোশামোদ করে নিজের মোটরে তুলে নিয়ে এসেছেন নিশান তুলবার জন্যে। একদা পড়াশুনা করে এই ইস্কুলকে ধন্য করেছে এমনি ধরনের কথা তাঁর মুখে। সুতরাং মাস্টারমশায়েরা অবাক হবেন বই কি!

অনুষ্ঠান শেষ হল। দূর্বাঘাসে আচ্ছন্ন মাঠের মাঝখানে প্রসন্ন বাতাসে নিশান উড়ছে। ভিতরের হলে গেছেন সবাই। প্রবীর বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল,

তার কাজ আছে অন্যত্র। দেখতে পেল, মদন একলা উঠানে। ঋজুপৃষ্ঠ মাস্টার অকস্মাৎ লাঠির মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছেন, ঘাড় বেঁকিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে সূর্যালোকে বিভাসিত নিশানের দিকে চেয়ে আছেন। আজকে ছাতা ঠেকনো দিয়ে দাঁড়ান নি, বদ্ধ ছাতা উঁচু করে সূর্যের দিকে ধরেছেন—চোখে যাতে ধাঁধা না লাগে, ভাল করে তাকাতে পারেন নিশানের দিকে। সাড়া পেয়ে তিনি প্রবীরের দিকে তাকালেন। বললেন, যা সব বললে, সত্যি তো বাবা? যারা সৎ আর পরিশ্রমী, সমাজকে ফাঁকি দেয় না—অন্নের অভাব হবে না তাদের কখনো? ছোট-মন ইতর লোকদের তোয়াজ করে বেড়াতে হবে না, অপমানিত হতে হবে না পদে পদে?

এ তো আপনারই কথা মাস্টারমশায়।

মদন আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি বলেছি? কই, মনে হচ্ছে না তো—

আপনি বলতেন, মাথার উপরে ঈশ্বর রয়েছেন, কাজে ফাঁকি দিও না, ব্যস। তিনি খাওয়াবার মালিক—জীব দেছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। সেই কথাটাই তো ঘুরিয়ে বললাম—ঈশ্বরের জায়গায় রাষ্ট্রের নাম বসিয়েছি। স্বাধীনতার জন্য উল্লাস করছি রাষ্ট্রকে মনের মতো করে গড়বার সুযোগ পাব বলে। রাষ্ট্র আর শোষক নয়—সেবক হবে সর্ব মানুষের।

ঐ একই ছাতা মদন মাস্টারের হাতে বছর আষ্টেক ঘুরছে, আরও আট বছর ঘুরবে এমন আশা করা যায়। কাপড়ের কালো রংটা কেবল ধূসর হয়ে গেছে, তা ছাড়া আর কোন খুঁত নেই। শীত-গ্রীষ্ম বসন্ত-বর্ষা সর্বঋতুতে সমান এই ছাতার ব্যবহার। শ্রাবণ মাসে ছাতা মেলেন বৃষ্টির জন্য, বৈশাখ মাসে রোদের চাড়ে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে রাত্রিবেলাও ছাতা খুলে চলেন। ছাতা ঠিক খাড়া থাকে মাথার উপরে ছবিতে দেখা পৌরাণিক রাজছত্রের মতন, খোলা ছাতা কাঁধের উপর ঠেসান দিয়ে চলা তাঁর অভ্যাস নয়। ছাতা দেখেই দূর থেকে বুঝতে পারা যায়—ছেলেরা বলে, ঐ আসছেন—

মফস্বল শহর—প্রায় গোটা শহরটাই মদন মাস্টারকে রোজ পরিক্রমা করতে হত। নদীর ধারে নৌকাঘাট—একটা কেরোসিনের আলো জ্বলে ঘাটের

উপর একতলা বাড়িটার দরজার সামনে। আলো থাকায় বিদেশি মাঝিদের আনাগোনার সুবিধা হয়, আর নৌকাঘাট বলে দূর থেকে বুঝতে পারে মাঝি-মাল্লারা। মদন মাস্টার দিনের প্রথম ছাত্র পড়াতেন ঐ একতলা বাড়িতে। পুরোপুরি দিনমান নয় তখনও, আকাশে পোহাতি তারা থাকত। ছেলে-মেয়ে, এক বিধবা বোন আর তিন-চারটি প্রাণী নিয়ে সংসার। ছাতের উপর চিলেকোঠায় শুতেন। তিনি যখন উঠতেন, আর তিন জন ঘুমে অচেতন থাকত। ঐ শেষরাত্রেই স্নান করে কলসি থেকে গোণা বারো-চোদ্দটি চাল মুখে ফেলে ঢক-ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে কাঁধে চাদর ও হাতে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। দুর্গা-দুর্গা—বলে দেয়ালে টাঙানো পটের দিকে চেয়ে প্রণাম করতেন। যাবার সময় বোনের নাম ধরে ডেকে যেতেন, ওরে পদ্ম, ওঠ্. এইবার—উনুনে আগুন-টাগুন দে—

বলে গেলেন এইমাত্র—তাকিয়ে দেখলেনও না, তাঁর আহ্বান কানে গেল কিনা। দেখার ফুরসৎ কই? টং-টং করে পাঁচটা বাজল কোন বাড়ির ঘড়িতে—কে যেন পাঁচবার চাবুক মারল তাঁর পিঠে। হাঁটা নয়—দৌড়চ্ছেন একরকম। এমন শক্তি শীর্ণ দীর্ঘ পা-দুটোর!

সমস্ত দক্ষিণপাড়া তীরবেগে অতিক্রম করে দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়েন নৌকাঘাটের উপর একতলা বাড়িতে। ঘাটের আলোটা তখনও জ্বলছে, নেভানোর সময় হয় নি। ছাত্রের নাম প্রবোধ—দোর খুলে সে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। মদন গিয়ে ডাক দিতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

আগের বছর পরীক্ষায় প্রবোধ ফেল হয়েছিল। তারপরই মদন মাস্টারের খোঁজ পড়ল, তাঁর পক্ষে পড়ানো সম্ভব হবে কিনা। সবাই ডাকে মদনকে—সময় কোথা তাঁর? দিনরাত্রি মিলিয়ে মাত্র তো চব্বিশ ঘণ্টা—তার ভিতর থেকেও খাওয়া ও ঘুমে ঘণ্টা আষ্টেক বাজে খরচ হয়ে যায়।* কিন্তু এরা নাছোড়বান্দা—অবশেষে তাই এই সময়টা সাব্যস্ত হল। মদন ছাত্রকে বোঝালেন, তোরও সুবিধে রে বাপু। শেষরাত্রি হল মুখস্থ করার সময়—সেই ভাল সময়টা পড়ে পড়ে নাক ডাকাস তোরা কুম্ভকর্ণের দল। তা আমিই এসে ডেকে

তুলব। আমি লাগিয়ে দিয়ে যাব—তারপর চালাতে থাকবি দশটা বেলা পর্যন্ত।

সেই প্রবোধ আজ ডাক্তার হয়ে শহরে বসেছে। খুব পশার—অঢেল পয়সা রোজগার করছে।

ওখানে সেরে মদন মাস্টার ছাতা খুলে ছুটতেন সিংহ-বাড়ির অভিমুখে। সূর্যবাবুর নাতি অলককে পড়াতেন। নাম-করা বড়লোক তাঁরা—সাহেব-ঘেঁসা। পৌনে সাতটা থেকে পড়াবার কথা। সূর্যবাবু বেড়িয়ে এসে ঘড়ি খুলে বারাণ্ডায় টেবিলের ধারে খবরের কাগজ পড়তেন। মদনকে উপরে উঠতে হত বারাণ্ডার অন্য প্রান্ত দিয়ে। কোনদিন একটু দেরি হলে সূর্যবাবু হাঁক ছাড়তেন, শুনে যান মাস্টারমশায়, এই দিক হয়ে যাবেন। কাছে এলে দেরি হবার কারণ জিজ্ঞাসা করতেন। দু-এক কথায় শেষ করে যে মদন উপরে চলে যাবেন, সে উপায় নেই। সূর্যবাবু এক সময়ে বড় উকিল ছিলেন—রিটায়ার করেছেন, কিন্তু জেরার অভ্যাস যায় নি। দু-মিনিট দেরির জন্য যথোচিত কৈফিয়ৎ দিয়ে উপরে উঠতে মিনিট দশেক লাগত। উপরে উঠার বিশেষ যে তাড়া থাকত তা নয়। অলক পড়ত না প্রায়ই। বলত, আজকে থাক মাস্টারমশায়, শরীরটা বেজুত লাগছে। বসে বসে চা খান, বলে আসছি। চায়ের কথা বলতে অলক বেরিয়ে যায়। চা সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে, কিন্তু অলক হয়তো আর আসে না।

কিম্বা হয়তো বলল, মাস্টারমশায়, আপনি পড়ে যান—আমি শুনি। শুনে শুনেই কাজ হবে। বলে সে ইজিচেয়ারে সটান গড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে বিবেকের দংশন-জ্বালা জাগে মদনের মনে—এখন এই গোলামির বেহদ্দ হচ্ছে, আর একদিন তিনি তেজ দেখিয়ে ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। বড্ড রাগ হয় নিজের উপরে—ছেলেটার উপরেও বটে। থাপ্পড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে করে অলককে। কিন্তু মুখে বিরক্তি প্রকাশ করবারও উপায় নেই—বাড়ির একমাত্র ছেলে, আদুরে ছেলে। ভালো মাইনে দেয়—সুতরাং যা করে, চুপ করে সয়ে যেতে হয়। মদন মাস্টারের পড়ানো নয়—মোসাহেবি অনেকটা।

সিংহ-বাড়ির পরে মদন প্রবীরকে পড়াতে যেতেন। ভাল ছেলে প্রবীর—ক্লাসে ফার্স্ট হত, ব্যায়াম-চর্চা করে মজবুত গড়ন হয়েছিল শরীরের, একটা মিথ্যা কথা পর্যন্ত সে বলত না। প্রবীরের মায়ের কিন্তু কিছুতে সন্তোষ নেই; চাকর অথবা ছোট মেয়েকে দিয়ে ছেলের অপরাধের ফিরিস্তি পাঠিয়ে দিতেন মাস্টারের কাছে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় কখনো বা একটুকরো কাগজে আনুপূর্বিক লিখে পাঠাতেন। অপরাধের তালিকার সঙ্গে মোটা বেতের লাঠিটাও পাঠাতেন প্রতিদিন। ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। অতএব কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সমাধা করে ছাতা খুলে মদন বাড়িমুখো ফিরতেন।

ধনুক-থেকে-ছোঁড়া তীরের মতো ছুটেছেন পথে—কেউ হয়তো ডাকল, মাস্টারমশায়!

হুঁ-হুঁ—

বলতে বলতে ততক্ষণে তিনি এক রশি এগিয়ে গেছেন। যে ডেকেছিল অতঃপর আর কিছু বলতে হলে তাকে দৌড়তে হবে মাস্টারের পিছু পিছু।

মোড়ের মাথায় সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মেয়েদের ইস্কুল সকাল সকাল বসে—সরস্বতী তিন-চারটি সহপাঠিনীর সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে যাচ্ছে। বাপের সঙ্গে যে চেনা-পরিচয় আছে, এমন ভাব দেখায় না সরস্বতী। অথচ এই ক-দিন আগে ঘুম ভেঙে দেখলেন, রাতদুপুরে এই মেয়ে এসে চুপি চুপি তাঁর পা টিপছে।

পদ্ম আসন পেতে ভাত বেড়ে তৈরি হয়ে থাকে। ছাতা ঐ খোলা অবস্থায় একপাশে রেখে ছাতার উপরে চাদরটা নামিয়ে রেখে মদন গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলতে থাকেন।

অতঃপর ইস্কুলের কাজ।

ইস্কুলের পর বাড়ি ফেরেন না, বিকাল থেকেই আবার ছেলে পড়ানো বাড়ি বাড়ি। কোথায় কতক্ষণ সমস্ত ঠিক করা আছে। এক তেলে-ভাজার দোকান থেকে ডালপুরি কিনে খেতে খেতে ছোটেন। টিউবওয়েলের কাছে আসবার আগেই ডালপুরি দু-খানা শেষ হয়ে যায়, হাত-মুখ ধুয়ে নেন ওখানে।

আরও চার জায়গায় পড়িয়ে রাত্রি ঠিক সাড়ে-দশটায় মদন বাড়ি ফেরেন। মোট সাতটা ট্যুইশানি হল। সময় কুলোলে আরও করতেন—প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু রাত্রি দশটার পরে মাস্টারের কাছে প্রাইভেট পড়বার মতো নিষ্ঠাবান ছেলে একালে অতি দুর্লভ।

বাড়ি ফিরলেন মদন, কিন্তু অবসর এখনো নয়। জমাখরচ লিখবেন পদ্মর কাছ থেকে প্রত্যেকটা খরচের হিসাব নিয়ে। মুক্তোর মতো গোটা গোটা পরিচ্ছন্ন অক্ষর। পনের বছরের সমস্ত জমাখরচের খাতা সযত্নে রাখা আছে কাঠের বাক্সের ভিতর। কার জন্য তিনি যেন নির্ভুল কৈফিয়ৎ রচনা করে যাচ্ছেন। জীবনের একটা মুহূর্তও অনর্থক নষ্ট করেন নি, এক সিকি-পয়সারও অপব্যয় হয় নি—তার এই অকাট্য দলিল।

তহ্‌বিল মিলিয়ে মজুত টাকা-পয়সা গণে খেয়ে-দেয়ে মদন ছাতে উঠে যান, সিঁড়ির দরজায় শিকল তুলে দেন। তার পরেও খানিকক্ষণ চিলে-কোঠায় আলো জ্বলে। পড়াশুনা করেন—নেসফিল্ডের গ্রামার, ভূগোল, মেকানিক্স। ট্যুইশানির জন্য এসমস্ত রপ্ত করে নিতে হয় মাঝে মাঝে।

ঘুমোবার আগে খোলা-ছাতে কিছুক্ষণ তিনি পায়চারি করেন। সবাই সুখসুপ্ত। মনে আত্মপ্রসাদ জাগে, এমন শান্তিতে ওরা ঘুমুতে পারছে—সে কেবল তাঁরই পরিশ্রমের ফলে। আহা ঘুমাক! আর পাঁচ-ছ'টা বছর—তার মধ্যে ছেলে কাজকর্মে লেগে যাবে। গোলামি ছেড়ে দিয়ে মদনের বিশ্রাম তারপর। শ্রীমন্তকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বাঙ্গালোর পাঠাবেন—চাকরি করতে দেবেন না, শিখে এসে সে ছোটখাট এক ফ্যাক্টরি খুলবে। তার জন্য কিছু জোগাড়ও করেছেন, আর এই পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে আরও কিছু হবে। পাখী যেমন একটা একটা করে খড়কুটো সংগ্রহ করে নীড় বাঁধবার জন্য, সকলের অজান্তে তেমনি তিনি সঞ্চয় করে যাচ্ছেন। আর, সরস্বতীর বিয়ে দেবেন প্রবীরের সঙ্গে। স্বাধীন-মনোবৃত্তিসম্পন্ন এই সব ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়—কি গভীর দরদ দেশের মানুষের প্রতি! প্রবীরের বাপের সঙ্গে পুরানো বন্ধুত্ব, সরস্বতীও দেখতে ভাল—চাপাচাপি করলে প্রসন্ন তাঁর

অনুরোধ ফেলবেন না কখনো। শুয়ে-শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে মদন মাস্টার কল্পনায় মনোরম ভবিষ্যৎ আঁকেন। দুর্ভোগ শেষ হয়ে এসেছে—আর পাঁচ-ছ'টা বছর মাত্র।

একদিন রাত্রে হঠাৎ মদনের ঘুম ভেঙে গেল। পায়ের ধারে সরস্বতী বসে। সে বলে, গরমে ঘুম হচ্ছিল না বাবা। ছাতে উঠে এলাম।

শিকল দেওয়া ছিল, খুললি কি করে?

কাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে খোলা যায়। আমি পারি।

সরস্বতী পা টিপতে লাগল। মদন মাস্টারের মনটা কেমন করে উঠল। বয়স হয়ে ইদানীং উচ্চারণে জড়তা এসেছে বলে তিনি যখন ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে মুখ ফিরিয়ে অঙ্ক বোঝাতে যান, নিচের ক্লাসের বাচ্চা ছেলেগুলো অবধি সেই সময় গণ্ডগোল করে। সূর্যবাবু টাকার দেমাকে অপমান করেন ফাঁক পেলেই। এসব কোন-কিছুই তাঁর মনে দাগ কাটে না। কিন্তু মা-মরা মেয়ে বড় হয়ে আজকে ঘুমের মধ্যে তাঁর প্রতি এই মমতা দেখাচ্ছে, একটি ক্লান্ত অসহায় শিশুর মতো তাঁকে ভাবছে—মদন মাস্টারের চোখ শুকনো রাখা দায় হয়ে পড়ে অতঃপর।

একবার অসুখ করল মদনের। ক-দিন পড়াতে যান নি, খবর দিতেও পারেন নি। সূর্যবাবু নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে নাতিকে নিয়ে দেখতে এলেন। শ্রীমন্ত তাঁকে বাইরের ঘরে বসাল। কিন্তু তিনি চিলেকোঠায় এসে দেখে যাবেনই। বললেন, বুড়োমানুষ—এদ্দূর ছুটে এলাম। কেমন আছেন, একটিবার নিজের চোখে না দেখে ফিরব কি করে?

পদ্ম তাড়াতাড়ি এসে মদনের ময়লা তোষক চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়, বালিশ দুটো সরিয়ে রাখতে যায় ছাতের উপর। মদন বললেন, দরকার নেই বোন, যেমন আছি দেখে যাক। এসব কিছু দেখবে না—অসুখ আমার সত্যি কিনা, সেইটে শুধু পরখ করে চলে যাবে।

সূর্যবাবু দেখে গেলেন, অলকও দেখল। পরদিন ইস্কুলে যাবার মুখে অলক আবার এল কিছু ফল কিনে নিয়ে। মাস্টারের অসুখে চিন্তিত হয়ে

ছাত্র নিজে উদ্যোগী হয়ে এইসব এনেছে, অপরূপ লাগল মদনের। চেহারাই কেবল চমৎকার নয়, এর মনটাও সুন্দর। মদন পরম আনন্দে হাত পেতে ফলগুলো নিলেন। বালিশের তলা থেকে একটা টাকা বের করে পদ্মর হাতে দিলেন, মিঠাই এনে খাওয়া অলককে।

না, এ উচিত নয় বাপু। কেন এসো পয়সা খরচ করে জিনিষ কিনে নিয়ে?

অলক বলে, নিয়ে আসি আমার ভাই-বোনের জন্য। আপনি তার মধ্যে কথা বলবেন কেন?

পদ্ম সেখানে ছিল, অলককে সে সমর্থন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, স্তম্ভিত হয়ে সে মদনের দিকে তাকাল। তাঁর চোখে-মুখে যেন অগ্নিকাণ্ড।

সত্যিকার ভাই-বোন নয়, এ তো বাপু মিষ্টি কথার প্রলেপ দেওয়া। তুমি এসো গরিবের উপকার করতে। সৎ ছেলে তুমি, মহৎপ্রাণ। কিন্তু আমাদের মর্যাদাহানি হয়। যা এনেছ, আজকে রেখে দিচ্ছি। আর এনো না কোনদিন।

অলক বিষণ্ন মুখে চলে গেল।

এর বছর-দুই পরের কথা। মদন ক্লাসে ছিলেন, অঙ্ক কষাচ্ছিলেন। ছেলেরা শক্ত একটা অঙ্ক দিয়েছিল বুঝে নেবার জন্য, সেইটে নিয়ে কঠিন ভাবনায় পড়েছিলেন। এমন সময় স্লিপ দিয়ে হেডমাস্টার অফিসে তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

যাচ্ছি রে বাপু—উষ্ণ কণ্ঠেই বললেন মদন। নতুন এই যে হেডমাস্টারটি এসেছেন, এঁর কাণ্ডজ্ঞান নেই। কাজের মধ্যে ডেকে পাঠিয়ে ক্ষমতা জাহির করেন।

ছেলেদের চুপ করে থাকতে বলে মদন অফিসঘরে চললেন। গিয়ে অবাক। সূর্যবাবু অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্য। রেগে আগুন হয়ে আছেন। বললেন, এখানে নয়—এখানে কথাবার্তা হবে না—বাইরে আসুন।

সজোরে মদনের হাত ধরে টেনে বাইরে চললেন।

অলক লিখেছে, পড়ুন। হস্টেল থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল, তার পাত্তা নেই। ভাবনায় পড়েছিলাম। এ চিঠির পর ভাবনা-চিন্তার কিছু রইল না।

চিঠিটা মদনের হাতে দিলেন। তিক্ত কণ্ঠে বললেন, কি ডাকিনী মেয়ে আপনার! আমার একমাত্র নাতি, কত বড় বড় জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসছে। একটা ষড়যন্ত্র বলে ঠেকছে।

বলে সূর্যবাবু এমন ভাবে তাকালেন, যেন মদন মাস্টারও ঐ ষড়যন্ত্রের ভিতর।

মদন বললেন, মেয়ের দুর্ভাগ্য, বড়ঘরের বাঁদরের ধাপ্পায় ভুলে গেল। আমি মামলা করব, আপনার নাতিকে জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।

মাসতুত বোনের বিয়েয় সরস্বতী দিন দশেক আগে কলকাতা গেছে। আর সে ফিরে আসবে না, অলকের চিঠি পড়ে নিঃসংশয়ে বোঝা গেল। ষড়যন্ত্রই বটে, অনেক দিন ধরে চলেছে।

মদন ক্লাসে ফিরে গেলেন সূর্যবাবুর সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে। গিয়ে পড়ালেন না, চেয়ারের উপর চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে পাষাণমূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে আছে ছেলেরা। তারপর একটা ছেলের হাত দিয়ে হেডমাস্টারকে লিখে পাঠালেন, মাথা ধরেছে—বাড়ি চললাম। ছেলেটাকে পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন, হেডমাস্টারের হুকুম আসবার অপেক্ষা করলেন না।

অসময়ে বাড়ি চলে এলেন। পদ্মকে ডাকলেন, শুনেছিস? সরস্বতী জলে ডুবে মরেছে।

বলো কি?

জলও নয়। পচা পাঁক।

আর কিছু না বলে গম্ভীর ভাবে ছাতে উঠে গেলেন। সিঁড়ির দরজায় শিকল তুলে দিলেন। বেলা পড়ে এসেছে। ছাতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি পায়চারি করলেন বার কয়েক। মাথা ধরেছে, ইস্কুল থেকে বলে এসেছিলেন—সত্যিই এখন মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। শুয়ে পড়লেন চিলেকোঠায়

গিয়ে। কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেয়ে গেছেন—বেশ তো, ভালই তো। যা-কিছু সঞ্চয় শ্রীমন্তেরই কাজে লাগুক। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢোকাবার তোড়জোড় কালকে থেকেই শুরু করে দেবেন। কত ছাত্র কত দিকে আজ কৃতী হয়ে বসেছে, সবাই শ্রদ্ধা করে। তাদের সাহায্য নিয়ে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢোকানো কঠিন হবে না তাঁর পক্ষে।

পাশবালিশটা কোলে টেনে নিলেন। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখেন তুলোর ভিতরে। জোড়ের মুখে নজর পড়ে চমকে উঠলেন, নূতন সেলাই যেন সেখানে! সেলাই খুলে ফেললেন তাড়াতাড়ি, তুলো টেনে টেনে বাইরে ফেললেন। দশ বছর ধরে জমানো দশখানি একশ টাকার নোট রেখেছিলেন পাশবালিশের ভিতর, এই পাশবালিশ বুকে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতেন। সরস্বতী টের পেয়েছিল কেমন করে।···মদনের হাসিও আসে। বরপণের টাকা নগদ আঁচলে বেঁধে তবে মেয়েটা বিদায় হয়েছে। দুহিতা কিনা—সমস্ত দোহন করে নিয়ে গেছে।

বৃত্তান্ত শুনে রাধাকান্ত এলেন। পদ্মর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি চলে যাচ্ছিলেন, মদন এসে দাঁড়ালেন।

কিছু বলবে?

একটু ইতস্তত করে মদন বললেন, হ্যাঁ—একটা কথা। তোমাদের ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে নাও না কেন শ্রীমন্তকে। কলেজে ভর্তি করে শিখিয়ে-পড়িয়ে আনব ভেবেছিলাম, সে আর হয়ে উঠবে না। টাকাটা বেহাত হয়ে গেল।

রাধকান্ত পরম আনন্দে বললেন, এ আর কি কথা! ভাগনে—অপর লোক নয়। কত বলে পরস্ত পর মানুষ হয়ে গেল।

মদন কঠিন স্বরে বললেন, পরের মতোই ব্যবহার করবে, কথা দাও—বাইরের আর দশজন যেমন আছে, শ্রীমন্তও তেমনি থাকবে। খাতির নয়, কোন রকম অনুগ্রহ নয়—গায়ে খেটে পেটের অন্ন জোগাড় করবে, আমি তাই চাই।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, বেশ তো! তোমার ছেলে—তুমি চাইছ, আমি বাদ সাধতে যাবো কেন?

•

শূন্য বাড়ি—পদ্ম আর মদন। পদ্ম বলছিল, কি হবে দাদা এতবড় বাড়ির ভাড়া টেনে? এ বাড়ি ছেড়ে দাও। ভাসুরপোরা চিঠি লেখালেখি করছে, আমিও দিন কতক ঘুরে আসি না-হয় সেখান থেকে।

মদন বলেন, বাড়ি ছাড়লে এমন জুতমতো বাড়ি কি আর পাব? ফ্যাক্টরি হবে বাইরের ঐ ফাঁকা জায়গায় শেড তুলে। ফাঁকার জন্য মন খারাপ হচ্ছে—কিন্তু এ আর ক-দিন? শ্রীমন্ত এসে বসবে, কত লোকজন খাটবে, তার বিয়ে দেবো। সংসার আবার জমজমাট হবে। প্রবোধকে বলেছি, টাকা দিতে হবে ফ্যাক্টরি আরম্ভ হবার মুখে। হ্যাণ্ডনোট লিখে কর্জ নেবো, সুদসমেত শোধ করে দেবো সচ্ছল অবস্থা হলেই। আর আমিও বসে নেই, দেখছি রোজগার করে কদ্দুর কি গোছানো যায়।

মদন মাস্টার বিপুলতর উদ্যমে ট্যুইশানি করছেন। যতটা কম দেনা করে পারা যায়। এবার মাসে মাসে হিসাবমতো টাকা পোস্টাপিসে জমা দিয়ে আসছেন, বাড়িতে রাখছেন না।

সরস্বতীরা ফিরে এসেছে। লোক-পরম্পরায় শোনা গেল, সূর্যবাবুর রাগ পড়ে গেছে, নাতি-নাতবৌকে সাদরে ঘরে তুলে নিয়েছেন। একদিন সরস্বতী অলককে নিয়ে এ বাড়ি এল বাপকে প্রণাম করতে। গয়না ও দামি শাড়িতে ঝলমল করছে সরস্বতী, একটু মোটা হয়েছে, ফর্সা রং আরও ফুটেছে। মদন প্রণাম করতে দিলেন না, তাড়াতাড়ি সরে গেলেন, নজর তুলে একবার তাকালেন না মেয়ে-জামাইর দিকে।

মাস তিনেক পরে পুজোর সময় শ্রীমন্ত বাড়ি এল। কাজের কত দূর কি শিখেছে সে বিষয়ে মদন আনাড়ি, কিন্তু বেশভূষায় ভোল ফিরেছে। এ তাঁর কল্পনার বাইরে, চিরদিন যা শিখিয়েছেন তার সম্পূর্ণ উল্টো। একদিন পড়িয়ে ফিরে এসে দেখলেন, শ্রীমন্ত বাড়ি নেই। পদ্ম হেসে বলল, চমকে

উঠছ কেন? তার মামার জন্মদিন—খাওয়াদাওয়া আমোদফুর্তি। রাতটুকু থেকে সকালবেলাই চলে আসবে।

বলে গেল না কেন?

ছেলেমানুষ তো! আগে খেয়াল হয় নি। যখন মনে পড়ল, আমাকে বলে-কয়ে চলে গেল।

কিন্তু শ্রীমন্ত পরদিন এল না, তার পরদিনও না। রবিবারে ট্যুইশানি নেই। রাধাকান্তদের বাড়ি মদন কখনো যান না, ওখানে যেতে মন চায় না—কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে আজকে চললেন সেখানে। অসুখ হল না কি হল? যা-ই হোক, একটা সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল রাধাকান্তর।

খবর নিলেন, শ্রীমন্ত উপরে আছে—ঘুমুচ্ছে। রাধাকান্ত নেমে এলেন এই সময়। সাগ্রহে মদনকে বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন। শত কণ্ঠে শ্রীমন্তের প্রশংসা করছেন। এমন বুদ্ধিমান ছেলে হয় না। আর তেমনি কর্মঠ।

মদন জিজ্ঞাসা করেন, এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছে, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি ওর?

রাধাকান্ত হেসে উঠলেন, বেলা হল কোথায়? আটটাও তো বাজে নি।

একটা চাকর যাচ্ছিল, তাকে বললেন, ওরে, নতুনবাবুকে ডেকে তুলে দে। নিচে আসতে বল্ শিগগির করে।

খানিক পরে শ্রীমন্ত এল। স্লিপিং-স্যুট পরা, স্লিপার পায়ে—ঘুমে চোখ ঢুলু; এ বাড়ি বাপকে দেখে সে চমকে গেল।

মদন কঠোর কণ্ঠে বললেন, চল্ আমার সঙ্গে।

বিকেলে যাবো।

না, এক মুহূর্ত আর নয়—

ছেলে চুপ করে থাকে।

যাবি নে?

কাজকর্ম শিখছি—সমস্ত ছেড়ে দিয়ে যেতে বলছেন?

হ্যাঁ। এদের মধ্যে থাকলে মনুষ্যত্ব যাবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

রাধাকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, অন্যায় জেদ তোমার। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ছেলে তোমার মতো দুয়োরে-দুয়োরে বিন্তের ফিরি করে বেড়াবে, সেইটে হল মনুষ্যত্ব? কিন্তু ছেলে আমার বোনেরও। গোঁয়ার্তুমি নয়—আখেরের কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে নিশ্চয় ওর ঘটে।

বয়ের হাতে চায়ের সরঞ্জাম—হাস্যমুখ সরস্বতী এল চা পরিবেশন করতে। সে-ও দেখি এসেছে এখানে। ভাই-বোন দিব্যি জমিয়ে আছে। বাপকে দেখে তারও মুখ পাংশু হল।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মদন গর্জন করে উঠলেন, যাবি নে তুই?

রাধাকান্ত বললেন, চেঁচামেচি কোরো না। মা-মরা ভাগনেটার তুমি যে হাল করেছ, আমি কিছুদিন রেখে সুস্থ না করে ওকে যেতে দেবো না। তুই উপরে চলে যা শ্রীমন্ত।

মদন মিনিট কয়েক হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন।

ভাড়া-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মদনমাস্টার ইস্কুলের বোর্ডিংএ উঠলেন। পদ্ম ভাসুরপোর কাছে চলে গেল। অকস্মাৎ তিনি যেন বিষম বুড়ো হয়ে পড়েছেন—বীরবিক্রমে ছুটোছুটি করে ট্যুইশানির ক্ষমতা আর নেই, ট্যুইশানি একেবারে ছেড়েছেন। ইস্কুলের সীমানা ছেড়ে বড়-একটা বেরোন না। কোনখানে যাবার নিতান্ত প্রয়োজন হলে ধপ-ধপ করে চলেন ছ্যাকড়াগাড়ির ঘোড়ার মতো। ছাতা খোলেন না মাথার উপর—বন্ধ ছাতা লাঠির মতো মাটিতে ঠেকনো দিয়ে চলেন। প্রাণ বলে কোন বস্তু আর নেই যেন দেহের কাঠামোর ভিতরে।

পতাকা-উত্তোলন উপলক্ষ করে প্রবীর এখানে এসেছে। আগের দিন সে মদন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করল। অনেক পুরানো কথা হল। কতকাল পরে যেন আপন লোকের দেখা পেয়েছেন—মদন মন খুলে গল্পগুজব করলেন। যখন প্রণাম করে সে বিদায় নিচ্ছে, মদন হঠাৎ বললেন, একটা কথা

তোমায় জিজ্ঞাসা করি বাবা। ট্যুইশানি নেই—বুড়ো হয়ে গিয়েছি, ছেলেরা মানে না, কেউ ডাকে না আর আমায় পড়াতে। ইস্কুলের চাকরিই বা ক-দিন থাকে দেখ। কাজকর্ম নেই—শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবি। ছেলেবয়সে খেটেখুটে পড়াশুনো করেছি, ভাল ছেলে বলে খ্যাতি ছিল, তামাক কিম্বা পানটুকুও কখনো খাই নি। তারপর এই বয়স অবধি—তোমরা তো সব জানো—এক তিল কাজে ফাঁকি দিই নি কখনো। তবু বুড়ো বয়সে একমুঠো ভাত কি একটুকরো কাপড়ের সংস্থান কেন থাকবে না আমার? সারা জন্ম খেটে গিয়েছি, ভাববার তো সময় পাই নি। আজকে খাটবার ক্ষমতা নেই—শুধুই ভাবি এখন শুয়ে শুয়ে।

কাল মদন প্রশ্ন করেছিলেন—আজকে স্বাধীন পতাকার নিচে দাঁড়িয়েও ভাবছেন সেই কথা। একটু যেন ভরসাও লাগছে—কোটরের ভিতর থেকে নিষ্প্রভ চোখ দুটোয় বুঝি আলো বেরুচ্ছে! আবার তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চান। বয়স হয়েছে, শরীরের উপর দিয়ে অনেক অযত্ন ও অত্যাচার গিয়েছে, খাড়া হবার ক্ষমতা হবে না হয়তো আর এ জীবনে। কিন্তু তাঁর না হোক—পরে যারা আসছে সেই সৎ পরিশ্রমী সন্ততিরা সকল সুবিধা পাবে তো জীবন-বিকাশের জন্য! না হলে কিসের তবে স্বাধীনতা? প্রতিটি মানুষ আত্মসম্মান ফিরে পাবে, ধনের লালসায় আদর্শ খোয়াবে না। প্রবীরের কথাগুলো মনে মনে জপমন্ত্রের মতো আবৃত্তি করছেন। এতকাল গৌরাঙ্গ-পদছায়ায় ক্ষমতার আসনে যারা বসেছিল, ভোল বদলে তারা আবার আসর জঁাকাবার ফিকিরে আছে। বাইরের ভোল বদলাচ্ছে, কিন্তু পুরানো অন্যায় পরিবেষ্টনীতে গড়ে-তোলা মন বদলাবার বস্তু নয়। তাদের দূর করে দিয়ে আমরা দশ জন আমাদেরই আপন লোক নিয়ে পঞ্চায়েত গড়ব। স্বাধীন হলে দুঃখের অবসান হবে এই আশ্বাসে দেশের মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, তাদের মানস-স্বপ্নে রঞ্জিত সর্বসুখের দেশ গড়ে তুলব আমরা।

অনেক দূরের পথ দিল্লি—

তা হোক, পথের শেষ বুঝি এবার আসন্ন! মদন মাস্টার তাই ভাবছেন।

১৫ই আগস্ট

শুনুন দুঃখের কথা। পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা-দিবসে জাঁকিয়ে আনন্দোৎসব করা হবে, এই ঠিক হল। মহেন্দ্র কর মশায় গ্রামের শীর্ষস্থানীয়—তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। আমরাও মেতে উঠলাম। যে সে ব্যাপার—কত দিন পরে স্বাধীন জাতি হতে যাচ্ছি আমরা, কত লাঞ্ছনা-নির্যাতন সইতে হয়েছে এর জন্য!

সভা হবে। আমি প্রস্তাব করলাম, মাস্টার মশায়কে এনে সভাপতি করা হোক।

কে মাস্টার মশায়?

পরিচয় দিতে আমার মতো যারা তাঁর ছাত্র ছিল, লাফিয়ে উঠল। আর সংখ্যায় আমরাই বেশি। আমাদেরই জেলার সদরে বাসা করে আছেন তিনি। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে মাস্টার মশায়ের।

তাঁর ছাত্রেরা অনুযোগ করে, কই কোন দিন তো বলো নি এসব কথা।

জবাব দেবার কিছু ছিল না, মৃদু হাসলাম। মহেন্দ্র করের ইচ্ছা ছিল না, ইচ্ছা হওয়ার কথাও নয়। তবু সকলের মতে তিনি সায় দিলেন। আর এখন তিনি দেখা হলেই আমাকে দোষেন। তোমারই জেদে হল। সমস্ত মাটি করলে এক পাগল জুটিয়ে এনে।

লজ্জায় আমি দশের মধ্যে মাথা তুলতে পারি নে।

১৯০৭। মিস্টার পি. এন. রায় বি.এ.—ফুটফুটে রং, মজবুত গড়ন, লম্বায় ছ-ফুটের উপর, খাড়া হয়ে বেড়ান, দুনিয়ায় গ্রাহ্য করেন না কাউকে। রাস্তা চলবার সময় কুটো-ইট-কাঠ জুতোর ঠোকরে বিশ হাত দূরে ফেলে দিয়ে

যান। চোস্ত ইংরেজি বলেন, মনে হয় যেন সাহেবে কথা বলছে। এ হেন মিস্টার রায় আমাদের স্কুলে সেকেণ্ড-মাস্টার হয়ে এলেন। তাজ্জব হয়ে গেল গ্রামের মানুষ।

মহেন্দ্র কর মশায়ের বাড়ির নিচের তলায় দু-খানা ঘর নিয়ে থাকতেন তিনি। তখন রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ কর—দোর্দণ্ড-প্রতাপ, জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে নাম কিনেছিলেন সরকারি মহলে। চাকরি উপলক্ষে রায় বাহাদুর বিদেশে থাকতেন। চকমিলানো প্রকাণ্ড বাড়ি তালা-বন্ধ থাকত। গ্রামের ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট তিনি। চিঠি লিখে তাঁর অনুমতি এনে রায়কে ঐ বাড়ি থাকতে দেওয়া হয়েছিল।

নূতন মাস্টারের কাজকর্ম করবার জন্য আমাদের পাড়ার এক কায়স্থের ছেলেকে ঠিক করা হল—নাম বাসুদেব। ত্রিসংসারে কেউ নেই, মতিহারি-তামাক বেচত সে হাটের দিন। মাতব্বররা বললেন, কেন এখানে-ওখানে ঠেলা-গুঁতো খেয়ে বেড়াচ্ছিস? শিক্ষিত লোকের সঙ্গে থাকগে যা—ভাল থাকবি।

বাসুর চাকরি হল। মিস্টার রায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে সে ছায়ার মতো। তাঁর রান্নাবান্না করে, ফাই-ফরমাস খাটে। তারপর ইস্কুলের দপ্তরির কাজটা তাকে দেওয়া হল। রায়ের পিছু পিছু সে-ও ইস্কুলে যায়, ঘণ্টা বাজায়, ক্লাসে হাজিরা-খাতা পৌঁছে দেয়। ছুটির পর দু-জনে একসঙ্গে আবার বাড়ি ফেরে।

হাটখোলার দোচালা-ঘরের দোকানদার সকলের অবহেলিত বাসু হঠাৎ সম্ভ্রমের অধিকারী হল রায়ের সান্নিধ্য পেয়ে। আমরা খাতির করে তাকে দাওয়ায় ডেকে বসাই। জল খেতে চাইলে ছুটে মেটে-কলসি থেকে জল গড়িয়ে এনে দিই। একথা-সেকথার পর রায়ের প্রসঙ্গ ওঠে, বাড়ির কথাবার্তা তিনি কিছু বলেন কিনা, এ গ্রামে কি জন্য এসে আছেন—

বাসু নড়ে-চড়ে মাদুরের উপর ভাল হয়ে বসে গল্প শোনায়। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল, সমস্ত বানানো। রায়ের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলে আমরা

তাকে সমীহ করতাম, এটা সে নষ্ট হতে দিতে চায় নি। বানিয়ে বানিয়ে তাই নানা অলীক কাহিনী বলত রায়ের সম্পর্কে। আমরা হাঁ করে শুনতাম তার প্রতিটি কথা।

বড়মানুষের ছেলের আজব খেয়াল। মাছের দাম আট আনা চাইলে পুরো টাকাটাই ছুড়ে দেন নাকি তিনি। মোটা মোটা খামের চিঠি প্রায়ই আসে, নোট থামের ভিতর।

নানারকম কাহিনী রটে গেল রায়ের সম্বন্ধে। কেউ কেউ এমনও কানাঘুষো করছে যে তিনি পুলিশের চর। দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছিল সে সময়টা। আমাদের গ্রামেও তার অল্পবিস্তর ঢেউ এসেছিল। এমন অবস্থা যে অচেনা ফকির-বোষ্টম এলে লোকে সন্দেহ করত, ঐ দাড়ি বা কণ্ঠীর ছদ্মবেশ নিয়ে পুলিশ গ্রামের ছেলেদের মতিগতির খবর নিতে এসেছে। রায়ের সম্পর্কে অবশ্য এ ধরনের ব্যাপারে বিশ্বাস করা শক্ত, তবু দু-একজনে তুলেছিল কথাটা।

মহেন্দ্র করের বাড়ির উত্তরে প্রকাণ্ড এক বাঁশবন। সেটা ছাড়িয়ে পঞ্চু বটব্যালের বাড়ি। পঞ্চুর ভাইঝি গৌরী এই সময়টা গ্রামে এসেছিল। পশ্চিমের জল-হাওয়ায় মানুষ—স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, রংও ফর্সা। তা সত্ত্বেও এতদিন বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। সেখানে বাঙালি খুব কম, উপযুক্ত ঘর-বর পাওয়া দুষ্কর। আর পাত্রী দেখতে পয়সা খরচ করে অত দূর কেউ যেতে চায় না। গৌরীর বাপ তাই মেয়েকে ভাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন কিছুদিন। সম্বন্ধ ঠিকঠাক হলে তাঁরা এসে বিয়ে দিয়ে যাবেন।

পঞ্চুর বড় পছন্দ হল রায়কে। যতদূর জানতে পেরেছে, তাদেরই পালটি ঘর। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা রায় কিছুতে দিলেন না, অভিভাবক কে কে আছেন তা-ও বললেন না। তবু পঞ্চু আশা ছাড়ে নি, নানা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে গৌরীকে দিয়ে পরিবেশন করায়। পানের ডিবেটা অবধি হাতে দিয়ে যায় গৌরী।

এই সময় এক অভাবিত ব্যাপার ঘটল। মিস্টার রায়ের বাপ এসে পড়লেন। আমাদের ছোট গ্রামে দস্তুরমতো এক নভেলি ব্যাপার। এর পর

দিন কতক ধরে সকলের মুখে এই গল্প। যে ক'টি নিন্দুক রায়ের নামে পুলিশ ইত্যাদি বলে রটনা করছিল, কাশীনাথ রায় এসে যাবার পর থেকে তারা চুপ হয়ে গেল। আমাদের চোখে আরও নব মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠলেন রায়।

চেহারা ও চালচলন দেখেই বোঝা যায় কাশীনাথ শাঁসালো ব্যক্তি—পরিচয় খুলে বলবার প্রয়োজন হয় না। খোঁজে খোঁজে এদ্দূর অবধি এসে পড়েছেন। কলকাতার যে লোক এখানকার সঙ্গে রায়ের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল, তারই কাছ থেকে ঠিকানা যোগাড় করেছেন।

চলো। তোমার মার অবস্থা বড় খারাপ।

না।

কাশীনাথ ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, যখন এসে পড়েছি, জোর করে ডুলিতে পুরে স্টেশনে নিয়ে তুলব। চিনিস নি আমায় এখনো।

রায় সংক্ষেপে জবাব দিলেন বেশ! নিজের ইচ্ছেয় পায়ে হেঁটে যাচ্ছি নে আমি।

বাপকে তিনি চেনেন, খুব ভাল করেই চেনেন। কাশীনাথ নরম হলেন, খুব কাতর হয়ে বললেন, বাড়ি চল বাবা। তোর মা কেঁদে কেঁদে শয্যাশায়ী হয়েছে। তাকে দেখলে পাষাণের চোখে জল আসে। গিয়ে একবার চোখের দেখা দেখে আয়।

রায় ঘাড় নেড়ে নির্মম কণ্ঠে জবাব দিলেন, নিয়ে যেতে পারলে আবার আটকে ফেলবেন। ও ফাঁদে আর পড়ছি নে। বেশ তো আছি। ওদিকে চুকে-বুকে যাক, তারপর যাব।

পঞ্চু দুপুরবেলা খেতে বলেছে কাশীনাথকে। খাওয়া-দাওয়ার পর তাকিয়া ঠেস দিয়ে কাশীনাথ গড়গড়া টানছেন, এই সময়ে সে কথাটা তুলল।

আমার ভাইঝিকে দেখলেন—ওকে গ্রহণ করুন না। দাদা পশ্চিমে কাজ করেন। নগদে বলুন, গয়নায় বলুন—সাধ্যমতো দিতে কৃপণতা করবেন না।

কাশীনাথ উদাস ভাবে বললেন, মন্দ কি! ওর মতামত জেনে দেখ। পছন্দ হয়েছে?

অপছন্দ বলে তো মনে হয় না। ইদানীং গৌরীকে ইংরেজি শেখাচ্ছেন। রোজ সকালে নিয়ে বসেন।

বেশ তো! বলে কাশীনাথ গম্ভীর মুখে ঘন ঘন গড়গড়ায় টান দিতে লাগলেন।

একটু চুপ করে থেকে পঞ্চু বলল, তা হলে দাদাকে লিখে দিই? কি বলেন?

কাশীনাথ সোজা হয়ে বসে বললেন, কি লিখবে বলো দিকি?

এই লিখব যে আপনি পরম দয়াবান—

হো-হো করে হেসে কাশীনাথ বললেন, না হয় হলাম দয়াবান—কিন্তু শ্বশুরের দয়া থাকলেই কি যে-সে ঘরে মেয়ে দেওয়া যায়? আমার আর কি খবর জান?

পঞ্চু বেকুব হয়ে চেয়ে রইল। কাশীনাথ তখন লম্বা ফিরিস্তি দিতে লাগলেন। দু-খানা বাড়ি কলকাতায়, ল্যাণ্ডো গাড়ি, এক সওদাগরি-হৌসের মুৎসুদ্দি তিনি, তিন ছেলের মধ্যে এই হল সকলের ছোট, এম. এ. পড়ছিল—

নিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, চড়কডাঙার চক্কোত্তিদের নাম শুনেছ নিশ্চয়। তাদের বারোআনি তরফের মেজকর্তা ঝুলোঝুলি করছেন তাঁদের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে। একমাত্র মেয়ে, পটের বিবি বললে হয়—তা ছাড়া অত বড় সম্পত্তির মালিক হতে পারত।

গড়গড়ার নল ফেলে গুম হয়ে বসলেন কাশীনাথ। পঞ্চু সদুঃখে বলল, তবে আর কি হবে দাদাকে লিখে? আমরা হলাম তাঁদের কাছে গোষ্পদের সামিল।

কাশীনাথ বললেন, তা বলা যায় না। লেখাপড়া শিখে আজকালকার ওদের আজব মতিগতি। বলে, বড়মানুষের ঘরজামাই হওয়ার মানে সোনার দাঁড়ে টিয়াপাখী হয়ে থাকা। ঐ ভয়ে পালিয়েছে। সে মেয়ের বিয়ে না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ফিরবে না, আমায় বলে দিয়েছে।

কাশীনাথ কোনক্রমে রায়কে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারলেন না, একলা ফিরে গেলেন। অতঃপর আরও খাতির বাড়ল রায়ের। পঞ্চুর বউ চন্দ্রপুলি ক্ষীরের-ছাঁচ তৈরি করে পাঠান। শেষটা বলে বসলেন, বামুনর রান্না ঐ ঘ্যাঁট কিছুতে তোমায় খেতে দেবো না বাবা। শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ি এসে দুটি দুটি খেয়ে যেও।

রায় ভালমন্দ জবাব দেন না, শুধু হাসেন মৃদু মৃদু।

নূতন রুটিনে রায় আমাদের ইতিহাস পড়াবেন। বুক দুরু-দুরু করছিল সর্বপ্রথম যেদিন তিনি ক্লাসে এসে বসলেন। সে আমলে একটা বই পড়ানো হত—ভারতে ইংরাজ-শাসন। দেশ অন্ধকারে ডুবে ছিল, ইংরেজ এসে অশেষ উদ্যমে আলোক-বিস্তার করেছে, রেলগাড়ি টেলিগ্রাম ইত্যাদি সহযোগে মরধামে স্বর্গের এক টুকরো এনে দিয়েছে—এই ছিল সমগ্র বইটার মর্মকথা। এর পরে কর্তৃপক্ষ বইটা তুলে দিয়েছিলেন ছাত্রদের মনের উপর অভিপ্রেত কাজ হল না দেখে। কাজ হল না এই রায়ের মতো মাস্টারদের জন্যে। প্রথম দিনেই ঐ বই পড়ানোর ঘণ্টা। কি চমৎকার বোঝালেন যে তিনি! অমন কড়া ইংরেজি একেবারে জল করে দিলেন ; বহু জন্মের ভাগ্যবলে ইংরেজের অভ্যাগম হয়েছে, একথা নিঃসংশয়ে বুঝে গেলাম। একজনকে দাঁড় করিয়ে পড়া জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার রায়। ছেলেটি ভাল, পরে সে বড় চাকরি পেয়েছিল। পুরো ঘণ্টা ধরে যত-কিছু পড়া হয়েছিল, সমস্ত সে মুখস্থর মতো গড়গড় করে বলে গেল। রায় সহাস্যে ঘাড় নেড়ে বললেন, ঠিক হয়েছে।

সকলের দিকে চেয়ে আবার বললেন, শুনলে তো তোমরা ? এই লিখলেই ভাল নম্বর পাবে। দু-একটা পয়েন্ট বাদ পড়ে গেলেও ক্ষতি হবে না। বাদ তো পড়বারই কথা—এত সদ্‌গুণ কেউ ঠিকঠাক মনে রাখতে পারে ?

ঘণ্টা পড়ে গেল এই সময়, চেয়ার ছেড়ে রায় উঠে দাঁড়ালেন। আবার একটু হেসে বলে উঠলেন, মুখস্থ রেখো, কিন্তু কেউ বিশ্বাস কোরো না এর এক বর্ণও। যা পড়ালাম, সমস্ত মিথ্যে। পাজির পা-ঝাড়া ওরা—

বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন আগুন ধরে গেল। বললেন, পলাশির

যুদ্ধে মগ্ন, জুয়াখেলায় এ দেশ জিতে নিয়েছে। আবার এই নতুন শয়তানি—বাংলা-দেশকে দু-টুকরো করল আমাদের প্রাণশক্তিকে পিষে মারবার জন্যে। হাতে রাখি পরে আমরা প্রতিবাদ করব। মাটি ভাগ করেছে, তা বলে মানুষ আমরা আলাদা হয়ে যাব না। কিছুতে না। বড় দুর্দিন আজ বাংলাদেশের।

পরের ঘণ্টায় যিনি পড়াবেন, তিনি দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। রায় মুখ ফিরিয়ে যেন অশ্রুরোধের চেষ্টায় অতি-দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

৩০শে আশ্বিন রাখিবন্ধন। ছেলেবুড়ো সকলে সার বেঁধে নদীতে স্নান করে এল। তারপর পরস্পরের হাতে হলদে রাখি পরিয়ে কোলাকুলি। এমন দিনে কিন্তু আমাদের ইস্কুল বন্ধ হয় নি বছর বছর কিঞ্চিৎ সরকারি সাহায্য পায় বলে। তার উপর প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র কর কিছুদিন হল ছুটি নিয়ে গ্রামে এসেছেন। লোকে বলে, চাকরি উপলক্ষে কি এক অঘটন ঘটিয়ে প্রাণের আতঙ্কে এখানে পালিয়ে রয়েছেন। থানা পাশের গ্রামে—সেখান থেকে অহরহ পুলিশ এসে হানা দেয়। বিশেষ, এই যে রাখিবন্ধনের আয়োজন হচ্ছে, এ সম্পর্কে তাদের তোড়জোড়ের অবধি নেই।

ইস্কুলে গিয়ে একটা কথা শুনে বড় আনন্দ হল। খুব তারিফ করছি আমরা ননীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। আমাদের ক্লাসের ননী—বয়সে সকলের ছোট, আর দেখতেও ননীর পুতুল। কিন্তু হলে কি হয়—ঐ ছেলে একটু আগে মহেন্দ্র করের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে এসেছে। হেসে হেসে সে মহেন্দ্র করের ঐ সময়ের মুখ-ভাবের বর্ণনা করছিল, এমনি সময় রায় এসে ক্লাসে ঢুকলেন আমরা যে যার জায়গায় বসে পড়লাম।

একটু পরে ছোট-দারোগা ও এক পাল কনেস্টবল জুতো মস-মস করে ক্লাসের দরজায় এসে দাঁড়াল। মহেন্দ্র তাদের সঙ্গে। ননীকে দেখিয়ে দিলেন, ঐ যে—

রায় মুখ ফিরিয়ে দেখলেন। পুলিশ দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল। ধমক দিয়ে উঠলেন, কি চাই?

ছোট বাবু বলল, ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিন তো—

গম্ভীর কণ্ঠে রায় বললেন, পড়া হচ্ছে—এখন নয়।

ছোট বাবু ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছিল। রায় গর্জন করে উঠলেন, খবরদার! এটা বিদ্যামন্দির।

চেয়ার ছেড়ে বাঘের মতো তিনি দরজা আটকে দাঁড়ালেন। তাড়া খেয়ে দারোগা হেন ব্যক্তিরও থমকে দাঁড়াতে হল এক মুহূর্ত। তারপর, অনেক দিনের কথা—বিস্তারিত বলতে পারব না। এইটুকু মনে আছে—ছোট বাবু ধাক্কা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল, রায় তার গালে কষে দিলেন এক থাপ্পড়। তারপর লাঠির পরে লাঠি। ক্লাসের সমস্ত ছেলে আমরা যেন পাথর হয়ে গেছি। চেঁচিয়ে উঠব, সে শক্তিও লোপ পেয়েছে।

সন্ধ্যার পর চুপি-চুপি গিয়ে রায়ের পায়ের কাছে বসলাম। চুপি-চুপি যেতে হয়েছিল, কারণ সকলে অত্যন্ত বিরূপ এখন তাঁর প্রতি। ছেলেপুলেদের তিনি অসৎ পথে মতি দিচ্ছেন, তাদের আখের খোয়াবার ব্যবস্থা করছেন—এ সম্বন্ধে কারো ভিন্ন মত ছিল না। আমি যাচ্ছি দেখতে পেলে পাড়ার প্রবীণেরা গালিগালাজ করতেন, হয়তো যেতেই দিতেন না মোটে।

বাসু একলা ছিল, আমায় পেয়ে বর্তে গেল। কুলুঙ্গিতে রেড়ির তেলের প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে, দু-জনে ছায়ার মতো পাশাপাশি বসে আছি, বিষম জ্বর এসেছে রায়ের। সহসা চোখ মেলে একনজর দেখলেন আমাদের। বলে উঠলেন, চলে যাব এখান থেকে। বিদ্যামন্দিরের মর্যাদা নিয়ে লড়লাম। হেডমাস্টারটা একনম্বর গাধা। কার কথাই বা বলি—গ্রামের লোকগুলোও মানুষ নয়। থাকব না আমি এখানে, এ আমার জায়গা নয়।

এত কথা না বললেও চলত। থাকতে এরাই দেবে না। আজকেই কথা হয়েছে—জরুরি মীটিং করে অবিলম্বে রায়কে বরখাস্ত করা হবে। নিতান্ত এই অবস্থা বলেই রাস্তায় তুলে দিতে পারে নি। ডাকের চিঠি পাছে ঠিক সময়ে না পৌঁছয়, সেজন্য কলকাতায় রায়ের বাপের কাছে লোক রওনা হয়ে গেছে।

আপদ-বালাই যত শীঘ্র সম্ভব গ্রাম থেকে বিদায় করে দিয়ে সকলে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলবে।

অনেক রাত্রি।. বাসু ঘুমিয়েছে, আমার জাগবার কথা। তারপর তাকে তুলে দিয়ে আমি আবার শোব। দেয়াল ঠেস দিয়ে বসেছিলাম, কোন সময় চোখ বন্ধ হয়েছে। চেষ্টা করেও ঘুম ঠেকাতে পারি নি। গোঙানি শুনে চমকে চোখ মেললাম। কি রকম করে তাকাচ্ছেন রায়, এক একবার উঠে বসতে যাচ্ছেন। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। দেখি, মাথার ব্যাণ্ডেজ রাঙা হয়ে গেছে। আবার রক্ত পড়ছে অনেক কষ্টে যা বন্ধ হয়েছিল।

এ অবস্থায় কি করব—ছুটি ছেলেমানুষ আমরা ভেবে ঠিক করতে পারি নে। ডাক্তারবাবুর বাড়ি ছুটলাম। বাসুকে বসিয়ে রেখে একলাই অন্ধকার বাঁশতলা দিয়ে ছুটছি। দুপুরবেলা এই কাণ্ড হয়েছে, এখন থমথম করছে চারিদিক। যেন শ্মশানপুরী।

বিরক্তমুখে বিড়-বিড় করতে করতে ডাক্তারবাবু বাইরে এলেন। এত কাতর হয়ে মাস্টার মশায়ের অবস্থা বলছি, তিনি কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না। বললেন, অমন হয়ে থাকে, ঘাবড়াবার কিছু নেই। নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখে একটা শিশিতে দু-দাগ অষুধ দিয়ে বললেন, এই খাইয়ে দাও গিয়ে। রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

আবার বললেন, খেতে দিয়েছ কি? কিচ্ছু দাও নি?

সেই সকালে চাট্টি খেয়েছিলেন, তারপর থেকে নিরম্বু—

সেই জন্যে এমন হচ্ছে।

ফিরবার পথে পঞ্চু বটব্যালের বাড়ি হয়ে এলাম। ওঁদের বাড়িতে ছেলেপিলের খাওয়ার জন্য সাবু-বার্লি কেনা থাকে, ওরা যদি দেন। নইলে এত রাত্রে কোথায় মিলবে রোগির পথ্য?

ওরা জেগে ছিল। পায়ের শব্দে পঞ্চু সাড়া দিল, কে?

আমি। বাটিখানেক বার্লি রেঁধে দিতে হবে।

পঞ্চুর বউ বলে উঠলেন, এখন—এত রাত্রে?

কিছু না খেয়ে কি রকম করছেন মাস্টার মশায়।

যা-যা-যা—বলে পঞ্চু বিষম তাড়া দিল। বিষণ্ণ মুখে ফিরে আসি। এসে দেখলাম, রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছেন।

পরদিন কাশীনাথ এসে পড়লেন। মাতব্বরদের সঙ্গে কথাবার্তা হল। মহেন্দ্র করের কাছে করজোড়ে তিনি মাপ চাইলেন। এই অবস্থায় টানাটানি করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন—কিন্তু মহেন্দ্র বললেন, এখানে চিকিৎসাপত্রের অসুবিধা। বিদেশি মানুষের ভালমন্দ কিছু হলে গ্রামের কলঙ্ক। খুব সাবধানে স্টেশন অবধি পৌঁছে দেওয়া হবে। গাড়িতে উঠতে পারলে আর হাঙ্গামা নেই—

অর্থাৎ এই আধ-মরা অবস্থায়ও তাঁরা একটা-দুটো দিন গ্রামে থাকতে দেবেন না। ও-অঞ্চলে পালকি যা পাওয়া যায়, আয়তনে অত্যন্ত ছোট। গুটিসুটি হয়ে কোন গতিতে বসা চলে। ঐ সঙ্কীর্ণ গহ্বরে তো কোনক্রমে ওঁকে ঢোকানো যাবে না। আমরা ক'টি ছেলে তখন বাঁশের চালি বেঁধে তার উপর মাস্টার মশায়কে শুইয়ে গ্রামের সমান রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে চললাম ছ-মাইল দূরবর্তী স্টেশনে। অতি সাবধানে নিয়ে চলেছি, যাতে তাঁর গায়ে নাড়াচাড়া না লাগে। গাড়ি এলে অনেক যত্নে একটা ইণ্টার-ক্লাসের কামরায় তুলে দিলাম। চোখ বুজে ছিলেন। গাড়ি ছেড়ে দিলে নিশ্বাস পড়ল, চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। সত্যি বড় ভালবেসেছিলাম তাঁকে আমরা।

কাশীনাথের কাছ থেকে ঠিকানা নেওয়া ছিল, একখানি চিঠি লিখলাম মাস্টার মশায়ের খবরাখবর জানার জন্য। মাসখানেক পরে জবাব এল, ঘা সেরে উঠেছে, কিন্তু মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ার দরুন মাথা বোধ হয় তাঁর খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তারেরা তাই বলছে।

এর পরে আরও দু-তিনখানা চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু জবাব পাই নি।

•

অনেক বছর পরে এই সেবার অভাবিত ভাবে দেখা হয়ে গেল।

কেরামত আলি ব্যাপারির সঙ্গে সদরে গিয়েছিলাম। এক বিলাতি কোম্পানির বড় পাটের আড়ত আছে—সেখানে একভরা পাট চালান দিয়ে

বিপদে পড়ে গেছে কেরামত। মালের এখন নানা রকম দোষ বেরুচ্ছে—লাল রঙের পচা-পাট, ভিজে জল-জব করছে, ইত্যাদি। অর্থাৎ কোম্পানির সম্প্রতি মাল কেনার গরজ নেই। কিন্তু কেরামত আলি যে মারা পড়ে! যে দর ওরা দিতে চায়, তাতে নৌকা আর গরুর গাড়ির ভাড়াও উশুল হয় না।

আমায় ধরে পড়ল, আপনি গিয়ে যদি একটু সই-সুপারিশ করে দেন! আপনাদের দেখলে সমীহ করবে, এ রকম গলা কাটতে সাহস করবে না।

আর এক ভুক্তভোগী ব্যাপারি সদুপদেশ দিল, শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। প্রিয়নাথ ম্যানেজার এক নম্বর ঘুঘু—কিছু কবুল করোগে। টাকাটা-সিকেটার কর্ম নয়—ভাল রকম ঝাড়তে হবে। তখন দেখো, ঐ পচা পাট সোনা হেন হয়ে উঠবে।

কেরামতের হাত এড়াতে না পেরে যেতে হল সদর অবধি। ফরাসে ম্যানেজারের হাতবাক্সর পাশে গিয়ে বসলাম। গোড়ায় চিনতে পারি নি। মানুষের চেহারা এমন বদলে যায়! লম্বা লিকলিকে দেহ, তামাটে গায়ের রং, শনের মতো দীর্ঘ লম্বা চুল। এই প্রিয়নাথই আমাদের আমলের মিস্টার পি. এন. রায়।

মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে তাঁর পায়ের গোড়ায় প্রণাম করলাম। আশ্চর্য হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি—হয়েছে কি?

চিনতে পারছেন না মাস্টার মশায়?

অবশেষে প্রিয়নাথ চিনলেন। অদ্ভুত মুখভাব হল তার—পুরানো দিনের স্মৃতিতে বোধ হয়। অন্তত প্রথমটা আমার তাই মনে হয়েছিল। আমার কথা শুনে তখনই একজন সরকারকে ডাকলেন। তার সঙ্গে দু-এক কথা বলে কেরামত আলি যাতে ন্যায্য দর পায়, তার ব্যবস্থা করে দিলেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে কাজকর্ম চুকল। এত বদনাম শুনেছি, আমাদের কিন্তু সিকি পয়সাও খরচ হল না এ ব্যাপারে।

আবার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠতে যাচ্ছি—প্রিয়নাথ বললেন, আর একটু বোসো। আমিও উঠব এইবার। আমার বাসা এখানে, বাসায় চলো যাই—

তাড়াতাড়ি একটা হিসাব সেরে তিনি উঠে পড়লেন। একরকম হাত ধরেই আমায় নিয়ে চললেন অনতি-দূরবর্তী তাঁর বাসাবাড়িতে। পুরানো বড় বাড়ির নিচের তলায় স্যাঁতসেঁতে একটি ঘর ও বারাণ্ডা। ছেলে-মেয়ে মোট ছ'টি। বড় মেয়ের বারো বছর বয়স, সকলের ছোটটি সবে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

প্রিয়নাথ হাঁক দিয়ে বললেন, লজ্জা করছ কাকে? আমার ছাত্র—ছেলের মতো। চা-টা নিয়ে এসো।

অতঃপর আর লজ্জা করলেন না প্রিয়নাথের বউ। লজ্জা করে আড়ালে থাকবার জায়গাও ছিল না। ঘর সাকুল্যে ঐ একখানি—রান্নাঘরও নেই, বারাণ্ডায় রান্নাবান্না হয়। অনেক কথাবার্তা হল। কিন্তু আমাদের সেকালের প্রসঙ্গ উঠতে গেলেই প্রিয়নাথ চাপা দিতে চান। তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বছর তিরিশ বয়সেই জরদ্গব বুড়ি হয়ে উঠেছেন, বাচ্চাদের নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন, আমার সামনেই ঠেঙানি দিলেন গোটা দুইকে ধরে।

সাংসারিক খবরও শুনলাম। কাশীনাথ মারা গেছেন। সে সময়টা প্রিয়নাথ বদ্ধ পাগল। ভাইরা সর্বস্ব ফাঁকিজুকি দিয়ে নিল। তাদেরও এখন নেই বিশেষ-কিছু। চুরির ধন বাটপাড়িতে যায়। তারপর অসুখ সেরে-সুরে গেলে মায়ের জেদে সংসার করতে হয়েছে। সেই মা-ও গত হয়েছেন।

আমার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথ রাস্তা অবধি এলেন। হঠাৎ বললেন, শোন—

পিছন ফিরে তাকালাম।

কেশে গলা সাফ করে তিনি বলতে লাগলেন, তোমাদের ওখানকার সে-সব কথা কেউ জানে না। প্রকাশ না হয়, দেখো। ছোটসাহেব প্রায়ই ইন্সপেকসনে আসে—বেটা অতি খচ্চর। সেই যে মাথা খারাপ হয়েছিল—মাঝে মাঝে সব গুলিয়ে যায়, কাজে ভুলচুক হয়। সেজন্য এমনই আমার উপর বিরক্ত। তার উপর ঐ কেচ্ছা শুনতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দেবে। আমার পরিচয় কাউকে বোলো না—বুঝলে তো?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

তবু ভরসা করতে পারলেন না প্রিয়নাথ। খপ করে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন।

দোহাই বাবা। এক কালে ছাত্র ছিলে, সেইটে মনে রেখো। চাকরি গেলে পথে দাঁড়াতে হবে বউ-ছেলেপুলের হাত ধরে।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি তাঁর মুখের দিকে। এই মানুষ বীরমূর্তিতে ক্লাসের দরজা আটকে দাঁড়িয়েছিলেন একদিন। সোনার দাঁড়ের টিয়াপাখী হবেন না বলে অবহেলায় অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার লোভ ছেড়ে আমাদের গ্রামে এসেছিলেন।

* * *

দেশ স্বাধীন। বীর পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর প্রয়োজন নেই। আমি তাই প্রস্তাব করলাম, মাস্টার মশায়কে আমাদের সভার সভাপতি করা হোক।

প্রিয়নাথের উপরওয়ালা বড়সাহেব ছোটসাহেব দুটোই বিদায় হয়ে গেছে। নূতন মনিব বিনোদানন্দের পরনে খদ্দর, মাথায় গান্ধি-টুপি। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়নাথের অফিসে ঢুকলাম।

আপনাকে যেতেই হবে।

মনিবের সামনে প্রিয়নাথের কথা সরে না। অবশেষে কাতর ভাবে বললেন, আমায় ওর মধ্যে কেন বাবা ?

আপনার চেয়ে যোগ্য লোক কে আছে মাস্টার মশায় ? মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, সে দাগ আছে বোধহয় এখনো।

বিনোদানন্দ গভীর কণ্ঠে বলল, প্রিয়নাথবাবু, এসব আমি তো কিছু জানতাম না। আপনাকে আমার নমস্কার জানাতে এসেছি।

নৌকায় গ্রামে ফিরছি। সাহস পেয়েছেন প্রিয়নাথ। পলিত কেশ সরিয়ে বললেন, অনেক কাল হয়ে গেল—দেখ্ তো, দাগ আছে না মিলিয়ে গেছে ?

আমি বললাম, রাজটিকার মতো জলজল করছে। আমরা জাঁক করে দেখাব মাস্টার মশায়ের মাথার কাটা-দাগ।

প্রিয়নাথ বড় প্রসন্ন হলেন। ঐ দাগের জন্য আতঙ্কের অন্ত ছিল না। আ
এখন ওরই খাতিরে হাজার ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও মনিব তাঁকে চাকরিতে বহাল
রাখবেন।

কিন্তু যজ্ঞ পণ্ড করলেন তিনি। বক্তৃতা করতে উঠে বললেন, বঙ্গভঙ্গ করছে
আমাদের পিষে মারবার জন্য। হাতে রাখি পরে আমরা প্রতিবাদ করব
মাটি ভাগ করেছে বলে মানুষ আমরা আলাদা হয়ে যাব না। কিছুতে না
বড় দুর্দিন আজকে দেশের।...

পনেরোই আগস্টের উৎসব-সভায় সভাপতির চোখে অশ্রু চকচক করতে
লাগল। চল্লিশ বছর আগে একদিন ক্লাসে যা বলেছিলেন, অবিকল সেই
কথাগুলি। ইতিমধ্যে আমরা কত এগিয়েছি, দু-শ বছরের অধীনতা-পাশ ছি
করেছি—কাগজ পড়েও কি পান নি এসব খবর? মাথার আঘাত-চিহ্
দীর্ঘ চুলের নিচে ঢেকে অখ্যাত নদীকূলে শুধুই কেবল পাটের হিসাব লি
দিন কাটিয়েছেন?

স্বাধীন দেশ। যাদের জন্য এতদিন ভয়ে ভয়ে নিশ্বাস ফেলেছি, আজকে বড়গলায় জাঁক করে বলে বেড়াচ্ছি তাদের গৌরব-কথা।

কানু গাঙ্গুলির স্মৃতি-সভা বিকাল পাঁচটায়। আমাদের কানাই—পুলিশের সঙ্গে অসম-সংগ্রামে যে প্রাণ দিয়েছিল গোটা তিনেককে ঘায়েল করে। আর এক সুবিধা হয়েছে, শঙ্কর-দা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তিনি সভাপতি। তাঁর চেয়ে বেশি কে জানে কানু গাঙ্গুলিকে? তাঁর মতো গর্ব কার 'কানাইয়ের মতো ছেলে দলে পেয়েছিলেন বলে?

সভার আধ ঘণ্টা আগে শৈলেনরা মোটর নিয়ে এসে দেখে, শঙ্কর-দার পাত্তা নেই। দরোয়ান বলল, এই খানিকক্ষণ আগে রাস্তায় বেরিয়েছেন বুড়োবাবু। এখনো ফেরেন নি।

শৈলেন ধমক দিয়ে ওঠে, যেতে দিলে কেন তুমি?

কিন্তু দরোয়ানকে অনর্থক দোষ দেওয়া। তাকে কেউ তো আগেভাগে সামাল করে দেয় নি! এমন ঘটতে পারে, মনেই আসে নি কারো।

এত উদ্বেগের মধ্যেও অতুল রসিকতা ছাড়ে না। বলে, দু দু-বার জেল-পালানো মানুষ, বন্দুক কাঁধে পাহারা দিয়ে ঠেকাতে পারে নি—দরোয়ানের বাপের সাধ্য কি ওঁকে আটকাবে!

শৈলেন বিষম ভয় পেয়ে গেছে।

মীটিঙের ভাবনা ভাবছি নে। সে যা হয় হবে। কোন দিকে কোথায় গিয়ে পড়বেন—জানেন না তো, ওঁদের সে সাবেকি আমল নেই। সুন্দরবনের চেয়ে সাংঘাতিক আজকের কলকাতা।

খোঁজ, খোঁজ! কিন্তু খুঁজবে কতটুকু জায়গায়? শহরের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। অতি-বড় দুঃসাহসীও নির্দিষ্ট সীমানার ওদিকে পা ফেলতে চায় না।

জনহীন রাজপথ। ট্রাম বন্ধ। কলকাতার পথে একটা মানুষ নেই—একি তাজ্জব! গলিটার ভিতর লোকের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে, শঙ্কর-দা ঢুকে পড়লেন সেখানে।

এতক্ষণে মানুষ দেখলেন—কিন্তু মুখ অন্ধকার, কটমট করে তাকাচ্ছে তারা শঙ্কর-দার দিকে। অস্পষ্ট কে যেন বলল, জবাই করো বেটাকে ধরে।

কৌতূহলে শঙ্কর-দা চোখ তুলে চাইলেন। ধীরে ধীরে নির্বিকার ভাবে এগিয়ে চলেছেন। গুটি চারেক ছোকরা গুলতানি করছিল বারান্দায় বসে—মন্তব্য তাদেরও কানে গেছে, তড়াক করে নেমে তারা রাস্তায় এল। শঙ্কর-দার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

কাকে কি বলল? ভাল বুঝতে পারলাম না।

একটি ছেলে জবাব দেয়, কিছু না—জোরে চলুন।

পুলিশের মতো ঘেরাও করে নিয়ে চলেছ, ব্যাপার কি ভায়ারা?

ছেলেটি রুক্ষস্বরে বলে, এ গলিতে ঢুকেছেন কেন?

কি করি, বড় রাস্তা যে শ্মশান! হাঁপিয়ে উঠছিলাম। তোমরা কি ধর্মঘট করেছ ভাইসব, গলির বাইরে পা মাড়াবে না?

গলির মধ্যেও সুখে আছি বুঝি মনে করছেন? বাইরের শিকার না জুটলে আমাদের উপর এসে হুমকি দেয়। বলে, এত করছি তোমাদের জন্য—টাকা দাও। কৃতজ্ঞতায় নয়—আতঙ্কে দু-দশ টাকা দিয়ে বিদায় করতে হয়।

আর একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, এত কাণ্ড হচ্ছে—কোন খবর রাখেন না আপনি?

জেলে ছিলাম। কি করে জানব বলো, লড়ায়ের হাত মক্স করছ তোমরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে?

আরও অনেকগুলি ছেলে জুটেছে, শঙ্কর-দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি চারিপাশে—পক্ষীমাতা অসহায় ছানাকে আগলে নিয়ে বেড়ায়, তেমনি কতকটা।

দীর্ঘ গলির অপর প্রান্তে এসে ছেলেগুলো হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। শঙ্কর-দাকে দেখিয়ে দেয়, পার হয়ে ও-ফুটপাথে চলে যান। ওদিকটা আপনাদের—কেউ কিছু বলবে না। আর কিন্তু কোনদিন এমুখো হবেন না, খবরদার!

শঙ্কর-দা সামনে যেটিকে পেলেন, থাপ্পড় কষে দিলেন তার পিঠে।

ওঃ, লাটসাহেব যেন হুকুম ঝাড়ছেন! আমার যেখানে খুশি যাবো। না এলে কি আলাপ-পরিচয় হত সোনার চাঁদ আমার এই ভাইগুলোর সঙ্গে?…আচ্ছা, আসি আজকের মতো। একটা সভা ডেকেছে, তাড়াতাড়ি আছে—

এদিকে এসে শঙ্কর-দা দেখতে পেলেন, গ্যাসপোস্টের ধারে জনকয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গলির মধ্যে অপসৃয়মান ছেলেগুলি লক্ষ্য করছে। একজনে তার মধ্যে এগিয়ে এসে বলল, কি শলাপরামর্শ হচ্ছিল? ওরা ভাই-ব্রাদার নাকি তোমার?

বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে শঙ্কর-দা চেঁচিয়ে উঠলেন।

সাতকড়ি যে! ভাল আছ তুমি সাতকড়ি?

সাতকড়ি ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করে দেখে। চিনতে পেরে তারপর চিপ করে পায়ের গোড়ায় প্রণাম করল। বলে, শঙ্করবাবু এদিকে? ভাল আছেন? বেশ তো জমিয়ে তুলেছিলেন দেখলাম। ভুজুং-ভাজাং দিয়ে আর এইটুকু নিয়ে এলেন না কেন? তিন জন মাত্র আছি এখন আমরা—তাই রাস্তার ওপার গিয়ে তেড়ে ধরতে ভরসা হল না।

তার মানে?

অনেক দিন সাতকড়ি শোনে নি এ কণ্ঠ, ভুলে গিয়েছিল। ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে।

মালপত্তোরের দরকার আছে শঙ্করবাবু? থাকে তো বলুন। কত চাই! রকমারি সব জিনিস—সে আমলে চোখেও দেখেন নি। দেশী পিস্তলও আছে

হচ্ছে, ফ্যাক্টরি বসে গেছে। 'দামও সস্তা—তখন হাজার দু-হাজারে যা মিলত না, এখন বিশ-পঞ্চাশে তাই বিকোচ্ছে।

শঙ্কর-দা সাতকড়ির হাত ধরলেন।

চাই বই কি সাতকড়ি। মালের খোঁজেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেক আছে বুঝি তোমাদের? চলো।

শৈলেনের মুখ শুকনো। সভার মানুষজনও অধীর হয়ে উঠেছে। কই, কখন আসবেন শঙ্কর-দা?

এত আয়োজন—সব বুঝি পণ্ড হয়ে যায়! স্তোক দিচ্ছে, আসবেন—এসে পড়বেন এক্ষুণি। লোকজন চলে না যায়, সেজন্য একজনকে সভাপতির আসনে বসিয়ে শৈলেন নিজেই বক্তৃতা শুরু করল। সে যুগের ওঁদের অলৌকিক কাহিনী বলছে। বলতে বলতে গলা কেঁপে যায়, চোখে জল আসে। মুখে বলছে এক, মনে মনে ভাবছে আর এক। ভাবছে, [illegible]ইয়ের স্মৃতি-সভা না শঙ্কর-দার শোক-সভা আজ এখানে?

বক্তৃতায় কান দিচ্ছে না বড় একটা কেউ। প্রশ্নের ঝড় ওঠে, কই মশায়, পাঁচটার জায়গায় সাড়ে-ছ'টা হয়ে গেল—এলেন না তো তিনি?

শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে।

আসবেন না তা হলে?

ভাসা-ভাসা জবাব দেয় শৈলেন। ঠিক বলা যাচ্ছে না, এসে পড়তেও পারেন। কানু গাঙ্গুলি তাঁর কত আদরের, জানেন তো আপনারা সকলে!

আসবেন না বোঝা গেল। দূর, দূর! ভাঁওতা দিয়ে এ[illegible] আমাদের।

হল প্রায় খালি। রক্ষা এই, চেয়ার ভাঙে নি, ইট-পাটকেল মেরে চুরমার করে নি সার্সি-খড়খড়ি। শৈলেনদের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যায় নি। নূতন স্বাধীনতা পেয়েছে, তারই ফল হয়তো।

আরও মিনিট কুড়িক পরে উদ্যোক্তারা অবধি চলে যাবে যাবে করছে, এমন

সময় আকস্মিক ভাবে শঙ্কর-দা উদয় হলেন। সাতকড়ি সঙ্গে এসেছে, তার কাঁধে চটের থলের মোড়া এক বোঝা।

একসঙ্গে অনেকে প্রশ্ন করে ওঠে, বেঁচে আছেন আপনি? কোথায় পালিয়ে ছিলেন বলুন তো?

চারিদিক তাকিয়ে দেখে শঙ্কর-দা বললেন, একটুখানি দেরি হয়ে গেছে—না?

একটুখানি—তা বটে!

শৈলেনের গলা ভারি হয়ে আসে।

মানুষজন গালিগালাজ করতে করতে চলে গেল। আমরা ভেবে মরি, কি হল না জানি শঙ্কর-দার!

শঙ্কর-দা বললেন, আমারও মনে হল—তোমরা সবাই ব্যস্ত হচ্ছ। থানায় যাবার পথে এইদিক দিয়ে খবর দিয়ে যাব বলে এসেছি।

থানায় কেন? চটের থলির দিকে আঙুল দেখিয়ে শৈলেন বলে, কি ওতে?

খোল সাতকড়ি, দেখিয়ে দাও এদের একবার। নয় তো বিশ্বাস করবে না। ভাববে, ওদের সভা পণ্ড করে বিনা কাজে এতক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম কোথায়।

কাঁধের বোঝা সাতকড়ি টেবিলের উপর নামাল। দড়ি দিয়ে শক্ত করে মুখ বাঁধা। খুলতে সময় লাগছে।

সাতকড়ি খুলছে, আর এদের দিকে রহস্যপূর্ণ চোখে চেয়ে টিপি-টিপি হাসছেন শঙ্কর-দা। আবার বললেন, যত সব অকেজো জিনিস—লোহালক্কড়, কাঠকুটো।

থলির ভিতর থেকে জিনিসগুলো বেরুতে সকলের চোখ ঝলসে ওঠে। রাইফেল, ব্রেনগান, ছোরা, রিভলবার। নূতন আনকোরা—বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ছে তার উপর।

বলেন কি দাদা? এই আপনার অকেজো জিনিস—লোহালক্কড়?

শঙ্কর-দা হাসতে লাগলেন।

কি কাজ আছে বলো এখন এসবের ? বাজে লোহালক্কড় ছাড়া আর কি বলা যায় ?

শৈলেন আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনার মুখে একথা ? কানুর হাতে প্রথম রিভলবার দিলেন, সেদিনের কথা মনে আছে। রিভলবার নয়—যেন শালগ্রাম-শিলা হাতে তুলে দিলেন পবিত্র পরিচ্ছন্ন ভাবে। কত কষ্ট করতেন এসব জোগাড় করবার জন্যে! বন্দুক চুরি করে পালাবার সময় একবার পা ভেঙে তিনমাস শয্যাশায়ী হয়েছিলেন, মনে নেই ?

সদুঃখে সাতকড়ি বলতে লাগল, আর আমরাও কি কম কষ্ট করেছি ? আমার দু-বছুরে মেয়ের গলার হার খুলে দুশো টাকায় বিক্রি করেছিলাম ঐ বন্দুকটার খোঁজ পেলাম যেদিন। তাতেও মিল না—শঙ্করবাবুকে শেষটা তাই চুরি করতে হল। পরিবারকে ধাপ্পা দিলাম, হার হারিয়ে ফেলেছে পাজি মেয়ে। বিনা দোষে সে মার খেল। মেয়েটাও নেই আজ বাবু।

গলা ধরে এল সাতকড়ির। মুহূর্তকাল সে চুপ করে থাকে। তারপর কেশে গলা সাফ করে বলল, মেয়েটা পুড়ে মারা গেল। আমাদের বস্তিতে আগুন দিয়েছিল, সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তাকেও বের করতে পারলাম না বাবু।

শঙ্কর-দা এসে গেছেন—খবরটা ইতিমধ্যে আশেপাশে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। লোকজন কতক কতক আসতে শুরু করেছে আবার। তাদের উদ্দেশে শঙ্কর-দা করজোড়ে বলতে লাগলেন, স্থবিরভায় যথাসময়ে এসে পৌছুতে পারি নি—আপনাদের বসিয়ে বসিয়ে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু কানাইয়েরই কাজ করছিলাম আমি।

পুষ্পমণ্ডিত বেদীর উপর সর্বত্যাগী আমাদের কানাই ছবির মধ্য দিয়ে মধুর হাসিভরা দৃষ্টিতে স্বাধীন দেশের নরনারীদের দেখছে। সেই ছবির দিকে নিষ্পলক চোখে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে শঙ্কর-দা আবার বলতে লাগলেন, কানাইদের কাজ এসব। ওরা চেয়েছিল স্বাধীন আনন্দময় দেশ। সেই স্বাধীন-তার চেহারা দেখে আজ দম বন্ধ হয়ে আসে। জেলে ছিলাম—আর নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে সোনার দেশের তোমরা কি হাল করে তুলেছ বলো দিকি ?

হঠাৎ আর একটা মনে পড়ে গেল বুঝি শঙ্কর-দার! সাতকড়ির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা—হিংসার পথ তুমি তো একেবারে ছেড়ে দিলে।

সাতকড়ি ঘাড় নেড়ে বলে, আলবৎ! ঝুটবাত আমি বলি নে। কিরে করেছি আপনার পা ছুঁয়ে—

কিন্তু তোমার দলের ওরা যদি দাঙ্গায় গিয়ে জোটে?

মানা করে দিয়েছি সবাইকে। শুনলেন না—আপনার সামনেই তো বললাম।

অভ্যাস-দোষ। মানা না শুনতেও তো পারে!

দাঁতে দাঁত ঘষে সাতকড়ি গর্জন করে ওঠে, মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলব না শালাদের?

শঙ্কর-দা হেসে উঠলেন।

এই দেখ। অভ্যাস-দোষ তোমারও। এ কি একটা বলে বসলে বলো দিকি? সবাই ভাই আমাদের। কথা দিয়েছ, ভাইয়ের গায়ে কক্ষণো আর হাত তুলবে না।

সাতকড়ি বেকুব হয়ে জিভ কাটল।

তাই তো! কি করব তা হলে, বলে দিন শঙ্করবাবু।

বুঝিয়ে বোলো। এগিয়ে গিয়ে বোলো, আমায় মারো আগে। অস্ত্র কাড়তে হবে না—অস্ত্র হাত থেকে আপনি পড়ে যাবে, দেখতে পাবে তখন। এত কষ্টের স্বাধীনতা বরবাদ হয়ে যাবে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে মরলে। কি বলো?

সাতকড়ি সায় দেয়, হাঁ—সে তো ঠিক।

শৈলেনের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে রুণু মালা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এতক্ষণে শঙ্কর-দার নজরে পড়ল। সাতকড়িকে দেখিয়ে বললেন, আমাকে নয় মা, এই একে। আজকের দিনের বীর এরাই। অক্ষম বুড়োমানুষ—ফুলের মালা ভারী বোঝার মতো লাগে যে আমাদের!

রুণু থতমত খেয়ে শঙ্কর-দার নির্দেশ মতো সাতকড়িকেই মালা পরিয়ে দিল। হাঁ-না একটা কথা বলল না সাতকড়ি—একদৃষ্টিতে রুণুর দিকে চেয়ে আছে।

যেন সে অন্য লোকে—এরা যা করছে, কিছুই টের পাচ্ছে না। রুণুর স্পর্শেই বুঝি তার সম্বিৎ ফিরল, চমকে উঠে তার মাথায় হাত রাখল। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে অশ্রুতে। বলে, শঙ্করবাবু, আমার মেয়েটাও এত বড় হয়েছিল। এমন ফর্শা ছিল না—গরিব আমরা, ধুলোমাটি মেখে থাকত, ফর্শা হবে কেমন করে ?

আরও লোক বেড়েছে, হলের অর্ধেকের বেশি ভরতি। শঙ্কর-দা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, ইনি সাতকড়ি—আমাদের পুরাণো বন্ধু। কানাই যে মসার-পিস্তলটা নিয়ে লড়েছিল, সেটার জোগাড় করে দিয়েছিলেন ইনিই। আমাদের অনেককেই ঐ সব জুটিয়ে এনে দিতেন।

চটাপট করতালি-ধ্বনি উঠল।

শৈলেন বলে, এঁর যত কিছু অস্ত্রশস্ত্র—সমস্ত আজ শঙ্কর-দার কাছে দিয়ে দিয়েছেন। এই সভা থেকে এঁরা সোজা থানায় যাচ্ছেন অস্ত্র জমা দিয়ে আসতে।

সাতকড়ি বলে উঠল, সব দিই নি মশায়। শঙ্করবাবুর সামনে ঝুট বাত বলব না—আছে সামান্য-কিছু। তবে ভালো মাল যা ছিল, সমস্ত দিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু কথা দিয়েছ যে মারামারি কাটাকাটি আর করবে না—

করব না-ই তো। জান গেলেও না। কিন্তু দুষমনেরা দোতলা-তেতলার উপর থেকে আমাদের কুত্তার মতো লেলিয়ে দেয় মশায়, তাদের জন্য রেখে দিয়েছি দু-একখানা। ভালো হাতিয়ারের দরকার নেই—ভোতা ছুরি-কাটারি উঁচিয়ে ধরলেই তারা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। অহিংস মতেই কাজ হয়ে যাবে, কিচ্ছু ভাবনা নেই।

হা-হা করে উদ্দাম হাসি হেসে উঠল সাতকড়ি।

তাঁতের মাকু

সবাই একে দুয়ে গ্রাম ছাড়ছে। ঘোষপাড়ায় আমরা বাইশ ঘর ছিলাম। সাত-আট বাড়ি পুরোপুরি তালা পড়েছে। বাকি যে চোদ্দ-পনের ঘর, তার মধ্যেও সোমত্ত মেয়ে-বউ বড় কেউ নেই। জোয়ান-যুবারাও বেরিয়েছে—কেউ গিয়েছে হিন্দুস্থানে চাকরির চেষ্টায়, চাকরি পেলে বাড়ির অবশিষ্ট ক'টিকে নিয়ে পাকাপাকি সরে পড়বে। কেউ বা গিয়েছে জমি কিনবার মতলবে—জমি পেলে একখানা দু-খানা খোড়োঘর তুলবে সেখানে। অশক্ত বুড়োহাবড়া ক-জন আছে, ভয়ে ভয়ে তারা দিনপাত করে। এই অমুক জায়গায় অমুক কাণ্ড ঘটল···নানা রকম গুজব কানে আসে। আর বুক দুরুদুরু করে তাদের।

সবেদ শেখ আমার দাওয়ায় বসে দুঃখ করে।

এ কি উৎপাত! তাকাতে পারি নে তোমাদের কায়েতপাড়ার দিকে। কত দেখেছি—ভাসানের দিন বাজার বসত, কত মচ্ছব! হিন্দুস্থান পাকিস্তান যাচ্ছে-তাই হোকগে—আমাদের ডোঙাঘাটা-গড়ডাঙার তাতে কি বাবু?

মনে যা-ই থাক—মুখে সদর্পে সায় দিই, বটেই তো! আমি ও-তালে নেই। জীবন যায় যাক, পিতৃপুরুষের ভিটে ছাড়ব না।

সবেদ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, জীবন যাবে—গেলেই হল অমনি! শেখপাড়ায় যতক্ষণ একটি প্রাণী আছে, কেউ তোমাদের কিছু করতে পারবে না।

সে কি জানি নে? জানি বলেই তো কলকাতা থেকে মামা চিঠির পর চিঠি দিচ্ছেন, তার জবাবটা পর্যন্ত দিই নে।

খোশামোদের আমেজ কথার মধ্যে। এ ধরনের কথায় কখন অভ্যস্ত ছিলাম না। গ্রামের তালুকের রকম দু-আনার শরিক—চিরকাল হাঁকডাক করে কাটিয়েছি। নিজেরই লজ্জা করে কেমন। কথার মধ্যে দীনতা ধরা

পড়ে যে পাকিস্তান হবার পর আমরা জিম্মি হয়ে পড়েছি ওদের। যত লুকোতে চাই, অসহায়তা স্পষ্ট হয়ে পড়ে কথাবার্তায়।

চিঠির পর চিঠি—মামা দিচ্ছেন না, আমিই দিচ্ছি তাঁকে। একখানারও জবাব আসে নি। মামা বলে ডাকি, কিন্তু আপনার কেউ নন—মায়ের মাসতুত না পিসতুত কি রকমের ভাই। খোকার অন্নপ্রাশনের সময় তাঁদের নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম। দেশ স্বাধীন হয় নি তখনো—হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের হাঙ্গামা ছিল না। তিন দিন থাকবেন বলে এসে কুড়ি দিন থাকতে হয়েছিল তাঁদের। পাড়াগায়ের ক্রিয়াকর্মে আত্মীয়-কুটুম্ব এলে সহজে তাঁরা বিদায় নিতে পারেন না, যাওয়া পণ্ড করবার জন্য জুতো-সারাসারি পর্যন্ত হয়। মোটের উপর, মামা-মামি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হয়েছিলেন আমাদের উপর। যাবার সময় বারম্বার বলেছিলেন, কলকাতায় গিয়ে আমরা যেন কিছুদিন তাঁর ওখানে থেকে আসি। আশৈশব কলকাতায় মানুষ, বাঙাল দেশের সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রান্ত ও ভয়ানক ধারণা ছিল—সে ধারণা কত ভিত্তিহীন উচ্ছ্বসিত ভাষায় তা প্রকাশ করলেন। সেই নিমন্ত্রণ এখন আমরা রক্ষা করতে সর্বতোভাবে প্রস্তুত, কিন্তু নিমন্ত্রণকর্তারাই সাড়া দিচ্ছেন না।

বাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। সুলেখাকে রোজ স্তোক দিচ্ছি, এলো বলে চিঠি। সে কলকাতা নেই আর তো—ভিন্ন রাজ্য হয়ে গেছে। চিঠি আসতে দেরি হচ্ছে। এই বারে এসে যাবে নির্ঘাৎ।

যাত্রার দিন দেখা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে দু-তিন বার। নিতান্ত নইলে নয়—এমনি সামান্য জিনিষপত্র নেওয়া হবে, তার ফর্দ করা হয়ে গেছে। বাঁধাছাঁদা হয় নি, কারণ তাতে জানাজানি হয়ে পড়বে। ঠিক করেছি, রাত্রিবেলা রওনা হব। চিরকাল মাতব্বর আমরা এ অঞ্চলের—দিন দুপুরে সকলের দৃষ্টির সামনে দিয়ে মাথা নিচু করে চলে যাওয়া সম্ভব হবে না কোন ক্রমে।

এদিকে দেরি হচ্ছে, আর সুলেখা ততই বকুনি দিচ্ছে আমাকে।

শুনেছ, পাটগাঁতির কিনু সরকারের সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছে। অত বড় গৃহস্থ—এখন কলাপাতা কেটে ভাত খাচ্ছে।

স্তম্ভিত হলাম। জিজ্ঞাসা করি, কোত্থেকে শুনলে? মারধোর করেছে কাউকে?

সুলেখা বলল, না—ঘুমুচ্ছিল সবাই। সিঁধ কেটে মাল সরিয়েছে। সে ঘরে কেউ ছিল না। থাকলে কি ছেড়ে দিত? খুন করে ফেলত একেবারে। কি অরাজক অবস্থা হচ্ছে—তুমি তো কিছু কানে নেবে না!

বোঝাবার চেষ্টা করা যেত যে, সিঁধচুরি নূতন ব্যাপার নয়—হামেশাই হয়ে থাকে। কিন্তু সে চেষ্টায় লাভ নেই, সুলেখা বুঝবে না কিছুতে। তার হাবেভাবে কথাবার্তার প্রতি মুহূর্ত উপলব্ধি করছি, সত্যি সত্যি কোন অত্যাচার হবার অনেক আগে শুধু আতঙ্কেই সে মারা পড়বে এ জায়গায় থাকলে।

এমনি সময় একদিন খবর পেলাম, তিন-চার ক্রোশ দূরের এক গ্রামে কর্মকার-বাড়ির এক বিধবা মেয়েকে দিন দুপুরে ধরে নিয়ে গেছে। সে রাত্রির অবস্থা বর্ণনা করতে পারব না। আলো জ্বালিয়ে বৈশাখের নিদারুণ গ্রীষ্মে দরজা-জানলার প্রত্যেকটি ছিদ্রপথ বন্ধ করে সুলেখা পাথরের মূর্তির মতো বসে। ভয় জিনিষটার সংক্রামকতা আছে। ছাত্রজীবনে লাঠি ও ছোরা-খেলা অভ্যাস করেছিলাম, রিভলভার নিয়েও নাড়াচাড়া করেছি দাদাদের শিক্ষাধীনে। ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্র চালাব, এই ছিল সে-আমলের সর্বোচ্চ বাসনা। এতকাল পরে আজকে মরচে-ধরা ছোরাখানা খুঁজে পেতে ধার দিয়ে নিয়ে আমিও বসে আছি সুলেখার পাশে। রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটুক—আর নয়, কালই রওনা হয়ে পড়ব। মামার চিঠি আসুক বা না আসুক—সেখানে গিয়ে পড়লে একটা উপায় হবেই।

সকালবেলা সবেদ শেখ গরু নিয়ে আমারই বড়-বাগের সংলগ্ন আউশ-জমিতে চাষ করছে। ওটাও আমার জমি—সবেদকে চাকরান দেওয়া। ভুঁইয়ের পাশে গিয়ে সবেদকে জিজ্ঞাসা করলাম, কর্মকার-বাড়ির ব্যাপারটা কি—বলো তো সবেদ।

সবেদ লাঙল থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, ছোঁড়াটা আমারই খালার বেটা। তোমরা গরম হচ্ছ ছোট বাবু এই নিয়ে, কিন্তু নচ্ছার হল মাগিটা। আরও অনেকবার সে ঝোঁক দিয়েছে। এখন তোমরা দুষছ আমাদের জাত ধরে।

সবেদের কথার ঢং ভাল লাগল না, অবাক হলাম। ব্যাপারটা যাচাই করে দেখবারও প্রবৃত্তি হল না, আশঙ্কা উগ্রতর হল—আমাদের পাড়াতেও যদি কোন অঘটন ঘটে, দোষ ঢাকবার জন্য এমনি কোন নিন্দা নিশ্চয় রটনা করবে ওরা।

কিরণ ডাক্তার খুব জমিয়ে আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, এই তো অবস্থা দাদা, এখন কি করা যায় বলো ?

ডাক্তার বিনা দ্বিধায় বললেন, চেপে বসে থাকো। বাপ-পিতামহের ভিটের পিদিম জ্বলবে না—এ কি একটা কথার কথা হল ? যত ভয় পাবে, ততই পেয়ে বসবে ওরা। আমি তো ঠিক করেছি, বেকায়দা বুঝলে বরং কলমা পড়ব ওদের সঙ্গে—তবু জায়গা ছেড়ে এক পা নড়ছি নে।

আমি গলা নিচু করে বললাম, আমার তত মনের জোর নেই ডাক্তারদাদা। চলে যাচ্ছি আমরা। আপনার কাছে এসেছি—আপনার জিম্মায় ঘরবাড়ি ফেলে রেখে যাব। বলেন তো লেখাপড়া করে দিয়ে যেতে পারি। আপনি দেখাশুনা করবেন, খাবেন আদায়পত্র করে। দু-দশ টাকা মাঝে মাঝে পাঠাতে পারেন ভালো—না পাঠাতে পারেন তাতেও ক্ষতি নেই। জানব যে, আপনার লোক—আমারই স্বজাতির পেটে যাচ্ছে।

ডাক্তার শিউরে উঠলেন, উঁহু · আমায় আর হাঙ্গামায় জড়িও না। নিজের যা আছে, তাই নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। সদরে আঠারো নম্বর নালিশ দায়ের করে এসেছি। ক-দিন বাড়ি থাকি, দেখতে পাও না ?

সমস্যার অবশ্য সুরাহা করে দিলেন। আমাকে আখেজ সরদারের কাছে নিয়ে গেলেন। আখেজ তালুকদার ব্যক্তি। তাঁর দলিচ-ঘরে খিল এঁটে তিন জনে পরামর্শ হল। তিন-জন ছাড়া কেউ আর জানবে না ভূ-ভারতে। কথাবার্তায় বুঝলাম, অনেকেই দ্বারস্থ হচ্ছে তাঁর কাছে। আর আখেজও যথাসাধ্য মুশকিল আসান করে যাচ্ছেন। তবে বহুলোকের ঝক্কি নিতে নিতে ইদানীং কাহিল হয়ে পড়েছেন, সেটাও সাস্থনয়ে বললেন। বাড়ি-ঘর-দোর যেমন আছে, তেমনি

থাক—আখেঞ্জই চোখে চোখে রাখবেন, এক ডেলা মাটি নড়বে না কোন দিকে।
ধান-জমি ও ডাঙা-জমির একটা দাম ধরে দিতে চাইলেন। পরিমাণ শুনে চক্ষু
কপালে উঠল।

ডাক্তার-দা বাইরে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, দর বড্ড কম দিচ্ছে,
বুঝতে পারছি—

সিকি দামও নয়!

কিন্তু উপায় কি বলো? নতুন আইন হচ্ছে, তাতে কেউ আমাদের জমাজমি
কিনতে ভরসা পায় না। আখেঞ্জ যে নিচ্ছেন—সে কেবল ওঁর অনেক আত্মীয়-বন্ধু
ঢাকায় জমিয়ে আছেন—সেই ভরসায়। কিনছেনও তাই জুয়াখেলার মতন
করে। লাগে তো বেশ-কিছু এসে যাবে, না লাগলে সব টাকা বরবাদ। দাঁও
মতো না পেলে এ কর্মে ভিড়বে কেন?

গরুর গাড়ি নয়—গরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ করে যাবার সময় জানাজানি হয়ে
যাবে—আখেঞ্জই তাঁর বড় ডোঙাটা দিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়ি
খাওয়া-দাওয়া সেরে চুপিসারে রওনা হলাম। সুলেখা হরলিকসের বোতলে
খোকার দুধ নিল। জিনিষপত্র অতি সামান্য—সীমানা পার হবার সময় যত
গোলমাল জিনিষপত্র নিয়ে। মানুষের যাচ্ছেতাই হোক গে—তিল পরিমাণ মাল
না সরে—রাষ্ট্রকর্তাদের এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর। আখেঞ্জ সবিস্তারে সমস্ত বুঝিয়ে
দিয়েছেন। তাঁকেই বলে গেলাম, চলে যাবার পর আমাদের বাড়ির জিনিষপত্র
সমস্ত সবেদকে দিয়ে দিতে।

প্রহর দেড়েক রাতে স্টেশনের কাছাকাছি তালতলার ঘাটে ডোঙা পৌঁছল।
স্বাধীন হবার পর ট্রেনও ইদানীং মরজি মাফিক যাতায়াত করে। তারবাবু
বললেন, জারিগান হচ্ছে—তাই শুনুনগে বসে বসে। ঘণ্টা বাজলে তখন এসে
টিকিট করবেন। গাড়ির ঢের ঢের বাকি—রাতের মধ্যে না-ও আসতে পারে।
সব দিন আসেও না।

ভয় হল। মনে মনে কালীতলায় মানত করি, অন্তত রাত্রিবেলার মধ্যে যেন

এসে বাস গাড়ি (যদিও জানি, মানত শোধ করবার জন্ত গ্রামে আসা হবে না আর ইহজন্মে)। বড় সমারোহ অনতিদূরে বাজারখোলায়—জারিগান বড় জমেছে। এখানকার বাজারের মহাজনেরা মিলে স্বাধীনতা-উৎসব করছে—সাত দিন ধরে চলবে এইরকম। এ সবে চিরদিন আমার উৎসাহ। দু-তিন ক্রোশ মাঠ ভেঙে জারি-ঢপ-কীর্তন শুনতে গেছি কতদিন! অতি চমৎকার গাইছে, খাসা লাগছে। কিন্তু ওদের মধ্যে গিয়ে বসবার সাহস নেই। কোন্ বিষম অপরাধ করেছি, ফেরারির মতো আমার চিরদিনের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি।

প্লাটফর্মের প্রান্তে কাঁঠালগাছের গোড়ায় ছায়ান্ধকারে মুখ ঢেকে আছি। কি বিপদ দেখ—চাঁদ উঠল আবার এই সময়।

…কোথায় লুকোলি রে খোকা ? দেখতে পাচ্ছি না। এই চোখ বুজলাম—এসো, খেয়ে যাও লক্ষীসোনা, আর দু-দলা মোটে আছে। দেখ, কাণ্ড দেখ ডাকাত ছেলের! পুকুরঘাটে চললি—অনেক জল, পা পিছলে গেলে আর উঠতে হবে না ওরে হতভাগা—

ঠাকুরমা বকছেন যেন আমায়।

বোঁচকার উপর বসে বসে একটু বুঝি ঝিমুনি এসেছিল! বুড়ী-ভদ্রার পাশে গ্রামের শ্মশান। চর পড়ে গিয়ে শ্মশানঘাটা এখন দূরে সরে গেছে। তিরিশ বছর আগে ঠাকুরমাকে যেখানে দাহ করে এসেছিলাম, নাটা-কালকাশুন্দেয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে জায়গা।

ঠাকুরমা না হন—তাঁরই মতো পাকা চুলওয়ালা এক বুড়ি। তিনি তাঁকে—সত্যিকার আপন জন কেউ নেই, আমাদের পাশের গ্রামে ভাই-সম্পর্কিত একজনের বাড়ি থাকতেন। সে আশ্রয়দাতা আগেই সরেছেন, উনিও চললেন বোধ হয় আজ। দেহ কুঁজো হয়ে গেছে—স্টেশনে লোকারণ্য দেখে ভয় হয়েছে—এই অবস্থায় চেনা-মানুষ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বয়স সত্তরের উপর হলেও নজরে জোর আছে, আমায় চিনে ফেললেন মুখ ফিরিয়ে থাকা সত্ত্বেও।

এই যে বাবা। পালাচ্ছ?

সচকিত হয়ে চারিদিক তাকাই। ওঁর কথায় আমার দিকে মনোযোগ না পড়ে যায় আর কারো! দু-কথায় মেটাবার উদ্দেশে তাড়াতাড়ি বললাম, কলকাতা যাচ্ছেন পিশি? বেশ তো, একসঙ্গে যাওয়া যাবে। কোথায় আছেন, দেখে রাখি। গাড়ি এলে এক কামরায় উঠব।

গাড়ি যখন এল, অবস্থা দেখে শিউরে উঠি। পোড় খেয়ে খেয়ে পৌরাণিক প্রহ্লাদের মতো হয়ে গেছে ইদানীং মানুষের প্রাণ—নষ্ট হবার নয়। গাড়ির ছাদের উপর মানুষ, ফুটবোর্ডের উপর মানুষ—পালাবার আগ্রহে এমন কি চাকার উপর দিকে লোহার শিকে মানুষ বসবার স্থান আবিষ্কার করে নিয়েছে।

দেখে নিতান্ত ভীরু চিত্তেও বীরত্ব জেগে ওঠে। কি করে যে গাড়িতে উঠে পড়লাম বাচ্চা ছেলেটি নিয়ে, আজও বলতে পারি নে। এবং বাচ্চা থাকার দরুনই শেষ পর্যন্ত স্থলেখার বসবার স্থান মিলল। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও দয়াধর্ম রয়ে গেছে কতক কতক মানুষের মনে।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। অনেকক্ষণ অমনি থেকে ঐ দাঁড়ানো অবস্থায় চোখ বুজেছিলাম একটা কোণ নিয়ে।

...হালদার-বাড়ি আমি যেন ঢুকে পড়েছি—পাতালভেদী সিঁড়ি দিয়ে নামছি অতল অন্ধকারে। নানা কিম্বদন্তী আছে জঙ্গলে ভরা আমাদের গ্রামের ভাঙা-চোরা এই অট্টালিকা সম্বন্ধে। চারিদিকে এককালে পরিখা ছিল, এখনও দু-দিকে তার অল্পসল্প চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। বর্ষায় জল জমে। ছেলে-বয়সে বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে আমরা চ্যাংমাছ মেরে বেড়াতাম ঐসব জায়গায়। চারিদিকে তো আটকা—কোথা দিয়ে মাছ আসত, জানি নে।

কয়েকটা উঁচু ভিটে বাইরের দিকে। সেখানে কসাড় বৈঁচিবন। পাকা বৈঁচি পেকে থাকত, সেই লোভে বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে কতদিন ওর

মধ্যে ঢুকেছি! বৈঁচে-কানন আর শামুকভাঙা-কেউটে আছে শুনেছি, তবু বৈঁচির লোভ ছাড়তে পারি নি।

বৈঁচি খেতে খেতে গুঁড়ি মেরে জঙ্গলের ভিতর অনেক দূর অবধি গিয়েছিলাম একদিন। এক জায়গায় নিচু পাঁচিল—হাত দেড়েক লম্বা-চওড়া ফোকর—সিঁড়ি চলে গেছে সেখান থেকে গভীর নিম্নদেশে। উপরে থেকে ঝুঁকে পড়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করলাম। দেখা গেল না, অন্ধকার। টপ-টপ করে জল পড়বার আওয়াজ হচ্ছিল। হাত বুলিয়ে দেখলাম, যেন ঘাম ফুটেছে সুরকির পলস্তারার উপর। সেদিন ফিরে এসেছিলাম, আজকে যেন নামছি আবার সেই সিঁড়ি দিয়ে। অনেক দূর নেমে গেছি, দম আটকে আসছে, বুকের উপরে কারা পাথরের পর পাথর চাপান দিচ্ছে। সাহায্য চেয়ে চিৎকার করে উঠি, গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না…

চোখ মেলে দেখলাম, না—গাড়িতেই রয়েছি। কিন্তু পরমাশ্চর্য ব্যাপার—দেদার জায়গা খালি পড়ে আছে। বসা কেন—দিব্যি হাত-পা মেলে শোওয়া চলতে পারে এখন। ব্যাপার কি, কোথায় গেল গাড়ির অত মানুষ?

উঁকি দিয়ে দেখি, স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে—প্লাটফর্মের উপর বাজার বসে গেছে। যাত্রীরা নেমে কেনা-কাটা, খাওয়া-দাওয়া করছে, অকারণ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেও অনেকে, দু-চারজন ইতিমধ্যে মাদুর ও সতরঞ্চি পেতে গড়িয়ে পড়েছে এক প্রান্তে ফাঁকা আকাশের নিচে। শেষরাত্রি, তারা ঝিকমিক করছে। সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে এতক্ষণের এই ধস্তাধস্তির পর। সীমান্তের স্টেশন এটা।

কতক্ষণ থাকবে এখানে?

একজন সহযাত্রী বললেন, ঠিক তো নেই মশায়। তিন-চার ঘণ্টা তো বটেই—সাত-আট ঘণ্টাও হয়ে যেতে পারে। সকাল হবে, কর্তারা ঘুম ভেঙে চা-টা খেয়ে আসবেন, এসে তন্নতন্ন করে দেখে-শুনে ছাড় দেবেন—তবে তো! এক-একদিন একটা-দুটো বেজে যায়।

গতিক সেইরকম বটে! রোদ উঠে গেছে, ট্রেন অনড় অবস্থায় লাইনের উপর। ইঞ্জিনের আগুন নিভিয়ে দিয়ে ড্রাইভার-গার্ডরাও মনে হচ্ছে কোনখানে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। এমন সময় এল প্রতীক্ষিত স্তাশস্তাল গার্ডের দল। ঝাঁক বেঁধে এসে পড়ল। পাতি-পাতি করে খুঁজছে, বিছানা-বাণ্ডিল খুলছে, বাক্স খুলে জিনিষপত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে, বচসা বাধছে যাত্রীদের সঙ্গে।

আর দেখা গেল, সাইডিঙে একখানা মালগাড়ি—তার সামনের জায়গাটায় চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে আদালত বসেছে হাকিম আছে, পুলিশ আছে। স্তাশস্তাল গার্ডরা আসামীদের ধরে ধরে হাজির করছে সেখানে। ঝড়ের বেগে বিচার-কার্য চলছে

থার্ড-ক্লাসের টিকিট নিয়ে ইণ্টারে উঠেছ কেন?

হুজুর—

দশ টাকা জরিমানা—

জায়গা পাচ্ছিলাম না, তার উপর পিছনের গুঁতো খেতে খেতে অজ্ঞান্তে উঠে পড়েছি হুজুর—

জরিমানা পনের টাকা—

একেবারে মারা পড়ব। হুজুর গরিবের মা-বাপ—

কুড়ি টাকা—

হাকিমের যত সময় নষ্ট হবে, জরিমানার পরিমাণ বাড়বে ততই। টাকা আদায়ের জন্ত আছে পৃথক এক দল—ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল তাদের কাছে। সাকুল্যে ছ-টাকা পাঁচ আনা সম্বল লোকটার—কুড়ি টাকা সে কোথায় পাবে? পুরল নিয়ে মালগাড়ির ভিতরে। একা সে নয়, আরও অনেককে পুরেছে। সব আসামি গ্রেপ্তার হয়ে গেলে চাবি পড়বে দরজায়। তারপর সদরে নিয়ে যাবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলি এখনো জানাজানি হয় নি সাধারণের কাছে।

আর্তনাদ ভেসে আসছে মালগাড়ির অভ্যন্তর থেকে।

ছেড়ে দেন হুজুর, নাকে খৎ দিয়ে যাচ্ছি। শ্বশুরবাড়ি মেয়েটা এখন-তখন। তাকে দেখবার জন্য ছুটেছি ধর্মবাপ—

আমাদের মফস্বল গাঁজি ছাগল চালান দিত। স্টেশন অবধি তাড়িয়ে এনে ওয়াগন বোঝাই করতে দেখেছি তাকে একাধিক বার। পাশাপাশি—ক্রমশ একটার উপর একটা—ছাগলের পা ওয়াগনের মেজে অবধি আর পৌঁছায় না (তখন আর ছাগল নেই, 'মাল' বলে পরিচয়)। ঘড়-ঘড় করে ওয়াগনের দরজা দিল এঁটে। একদিন ঐ অবস্থায় পড়েই রইল স্টেশনে।···দেশ স্বাধীন হবার পর আজকে আবার তেমনিধারা মাল-বোঝাই এই দেখতে পাচ্ছি।

এই রে:—লড়াই বাধল বুঝি ওদিকে! পিশির গলা শুনে ছুটলাম। পিশি সহজে কায়দা হবার বস্তু নন মালগাড়ির ঐ আসামিগুলোর মতো।

কিছু না বাপু, দুটো ছেঁড়া লেপ-কাঁথা। সামনে শীতকাল—কোন আস্তাকুড়ে পড়ে থাকতে হবে, জানা নেই তো!

খুলে দেখব।

অমন জুত করে বেঁধে-ছেঁদে এনেছি। কথায় পেত্যয় হল না?

আমরাই আবার বেঁধে দেব। কিছু করতে হবে না আপনাকে। যেমন আছেন, অমনি বসে থাকুন।

ওদের একজন বাণ্ডিলটা উঁচু করে তুলে ধরে বলে, কিসের বিছানা—তূলোর বিছানা এত ভারি হবে কেন?

বিছানার ভিতর থেকে বেরুল কাঁথায় জড়ানো থালা-ঘটি-বাটি। বাসন-গুলো একজন তুলে নিয়ে চলল।

যাও কোথা সোনামাণিক? আমার জিনিষ দিয়ে যাও।

চুরি করে মাল সরাচ্ছিলেন—সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

চুরির কথায় পিশি ধৈর্য হারালেন।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ক্ষিরোবামনি চোর? কার ঘরে সিঁদ কাটতে গিয়েছি—হ্যাঁরে অলপ্পেয়ে?

তুমুল ঝগড়া। আমি গিয়ে নিরস্ত করি। লোক জমে গেছে। ক্ষিরো-

পিশি বক্তার বেগে ব্যাকরণ-বহির্ভূত অসংখ্য বিশেষণে আপ্যায়িত করছেন সর্ব-সমক্ষে। এ-অবস্থায় ঠাকরুনকে ক্ষমা করে ফেলাই যুক্তিযুক্ত মনে করল ছোকরাটি। সকলের দিকে চেয়ে বলল, বেশ—ছেড়ে দিচ্ছি আপনারা দশ জনে যখন বলছেন। কিন্তু পিতল-কাঁসা নিয়ে সীমানা পেরুনো চলবে না। উনি বাড়ি ফিরে যান—সমস্ত দিয়ে দিচ্ছি।

বয়স হয়েছে তো ক্ষিরোদার—এতক্ষণের সংগ্রামের পরিশ্রমে তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। বললেন, তাই দে, এক্ষুনি দিয়ে দে। না দিস তো অষ্টি-বড় দিব্যি।

বাসন ফিরিয়ে দিয়ে তখন সে প্লাটফর্মের পথ আটকে দাঁড়াল। ট্রেনে উঠতে দেবে না কিছুতে।

সেই বিষম ভারী বোঝা নিয়ে ক্ষিরোপিশি চললেন বাজারের দিককার সড়ক বেয়ে। নদীর ধারে গিয়ে মুহূর্তকাল দাঁড়ালেন। তারপর নেমে চললেন নদীগর্ভে। ঝপ্‌পাস করে জলে ফেলে দিলেন বাসনের বোঝা। দিয়ে ফোকলা দাঁতে বুড়ির সে কি হাসি!

হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন, তুই পেলি নে লক্ষীমাণিক, আমিও না—মা গঙ্গা নিয়ে নিলেন। ক্ষমতা থাকে জেলে ডেকে জালাজ করে তোলগে এবার—

ছোকরাটির ফর্শা চেহারা। দেখি, জলন্ত আগুনের মতো গনগন করছে তার মুখখানা। কিন্তু ক্ষিরো-বামনির ব্যাপারে জুত হবে না বুঝে সে এদিক থেকে সরে পড়ল।

হরিনাথ মড়ার মতো ফ্যাকাসে মুখে অভ্যর্থনা করলেন, এসো—এসো। খবর কি বাবাজি?

বুঝতেই পারছেন। সেই যে মাঘ মাসে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন, নেমন্তন্ন রাখতে এলাম।

হরিনাথ বললেন, বেশ করেছ। আসবে বই কি বাবা! কিন্তু মাঘের পর কত হাঙ্গামা হয়ে গেল—সেটাও ভাবো একবার।

দাঙ্গার কথা বলছেন ?

সে তো কবে মিটে গেছে! তার চেয়েও বড় হাঙ্গামা—আমরা স্বাধীন হয়েছি।

ভালই তো মামা—

হরিনাথ ঢোঁক গিলে বললেন, তা ঠিক। খবরের কাগজে ভাল-ভাল করছে—ভাল বই মন্দ হবে কেন? কিন্তু আমরা কুলিয়ে উঠতে পারছি নে যে!··এসো বউমা, দেখি—খোকাকে কোলে দাও। আমায় চিনতে পারো দাদু? সেই যে গিয়েছিলাম। কত আমোদ-স্ফূর্তি করলাম, ভাল-মন্দ খেয়ে এলাম।

ভিতরে নিয়ে চললেন। ঢুকবার পথ অতি সঙ্কীর্ণ, জিনিষপত্র ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হয়।

বাইরে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এসব বাক্সপেটরা তোলা হয় নি কেন মামা?

হরিনাথ বললেন, মানুষেরই বলে জায়গা হয় না! মানুষের অন্ত আছে? ঘর-বারাণ্ডা ভরে গিয়ে এখন ছাতের উপর ত্রিপল খাটিয়ে বসত করছে।

সত্যি, ছোট্ট বাড়িখানা জনারণ্য। কি কৌশলে লোকে যে এর মধ্যে গা বাঁচিয়ে চলাচল করে, কিম্বা এই হৈ-হল্লার মধ্যে কেমন করে চোখ বুঁজে নিঃসাড়ে ঘুমোয়, সেই এক পরম বিস্ময়।

দোতলার কোণে পার্টিশন-করা আধখানা কুঠুরি হরিনাথের দখলে। সেখানেও কসরৎ করে ঢুকতে হয়। একটা পরিবার দরজা অবধি হোগলা দিয়ে ঘিরে দু-হাত বারাণ্ডার উপর দিব্যি সংসার পেতে আছে।

ভাড়া দিয়েছে এখানটাও?

হরিনাথ বললেন, চুপ! বাড়িওয়ালা থাকে এ কুঠুরির বাকি আধখানায়। মোটা টাকা পাচ্ছে, ছাড়বে কেন? আবার তা-ও বলি, ভাড়াটে ডাকতে হয় না আজকাল। তারাই হাত-পা ধরে কান্নাকাটি করে এসে ওঠে।

ক্লান্ত সুলেখা কাপড়-চোপড় ছাড়তে পারছে না আমরা রয়েছি বলে।

হরিনাথ বললেন, চলো বাবাজি, ফুটপাথে বেড়িয়ে বেড়াইগে খানিক। দিব্যি হাওয়া—শরীর জুড়িয়ে যাবে। মা-লক্ষ্মী চান-টান সেরে নিন ততক্ষণ—

যেতে যেতে আশেপাশে গৃহস্থালিগুলোর দিকে ঘৃণা ভরে তাকিয়ে বললেন, রয়েছে কি রকম দেখ—গরু-ছাগলের বেহদ্দ। আবরু-পর্দা নেই—রাস্তা তো রাস্তাই-সই, স্টেশন তো স্টেশনই। সেইখানে উনুন জ্বালিয়ে ভাতে-ভাত চাপাল, ঠ্যাং মেলে ছেলে গেলাতে বসে গেল।

বললাম, কার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে, তাই ভাবি আমা। আমরা তো কিছু করি নি। কায়-মনে সর্বদা দেশের মঙ্গল চেয়েছি, আলস্য-বিলাসিতার প্রশ্রয় দিই নি কখনো।

বেকুব হলেন হরিনাথ। ওঁরা সাধারণত স্বদলীয়দের মধ্যে যেমন বলাবলি করেন, তেমনি বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। আমার সংসারের শান্তি ও উচ্ছলতা দেখে এসেছিলেন—সমস্ত ফেলে এসে আমিও আজ যে এই দলে জুটেছি—সে খেয়াল হয় নি ওঁর। কৈফিয়তের ভাবে কি-একটা বলছিলেনও যেন, কিন্তু আমার কিছু কানে গেল না। চোখ জলে ভরে এল…

…দিগন্তব্যাপ্ত সবুজ ধানের সমারোহ—পুকুরঘাট সেই ধানবনের প্রান্তে। ঐ আমার চোখের সামনের ছিন্নবাস মলিন বউটা বোধকরি এই সেদিন পর্যন্ত এমন সময় বাসন মেজেছে ঘাটে বসে। দূরের হাওয়া খেলা করত তার মাথার ঘোমটা খুলে দিয়ে এলোচুলের গুচ্ছ উড়িয়ে। সামলাতে হিমসিম হত সে। বাহিরবাড়ি অনতিদূরে, তার ওদিকে ভিতরবাড়ি। বড় বড় টিনের ঘর, সারি সারি গোলা। এক এক রাত্রে ঘর-দোর-উঠান এখনও জ্যোৎস্নায় পরিপ্লাবিত হয়ে যায়, কদম বকুল আর বাতাবিলেবু-ফুলের গন্ধে উতলা হয় চতুর্দিক…

কিসে কি হয়ে গেল ঈশ্বর, ভিখারির অধম হয়ে শহরের আস্তাকুড়ে হাত পেতে বেড়াচ্ছি।

আড়াইটা বেজেছে। এতক্ষণে মামি ভাত নিয়ে এলেন। খাচ্ছি একলা

আমি—মামা সামনে বসে খাওয়াচ্ছেন। খাওয়ার উপকরণ যৎসামান্য—একটা চচ্চড়ি ও ডাল।

হরিনাথ বললেন, মাথা ধরেছিল বাবা, বাজার [illegible] পারি নি। চাকর ছোঁড়াও পালিয়ে গেছে। কষ্ট হবে তোমার বড্ড।

সলজ্জে প্রতিবাদ করি, না-না—বেশ খাচ্ছি তো আমি। বেলা হয়ে গেছে, আপনিও বসে যান মামা—

বসব এইবার। অফিসের ছুটি—ছুটির দিন বেলা করে না খেলে খিদে হয় না। খাও, তুমি খাও—

খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছি ঘরের কোণে সরু তক্তাপোশখানার উপর। গোটা ছয়-সাত ছেলেমেয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে। পথে [illegible] ধকল গেছে—কিন্তু পাঁচটা মিনিট ঘুমিয়ে নেব, সে উপায় নেই।

মামা এলেন একটু পরেই। পান চিবোচ্ছেন।

এর মধ্যে হয়ে গেল ?

হ্যাঁ বাবা। দাঁতে কি হয়েছে, চিবোতে গেলেই কনকন করে ওঠে। দু-এক গ্রাস চিবিয়ে উঠে আসতে হল।

ডাক্তার দেখান না ?

তারা বলে, সবগুলো দাঁত উপড়ে ফেলতে হবে। তোমার মামি তাতে রাজি নন। তাই এই ভোগান্তি!

সন্ধ্যার পর অবসর পেয়ে মামি উপরের ঘরে এসে বসলেন।

ভালো করে একটা কথাই বললেন না মামিমা, রাগ করেছেন বোধ হয়। আসবার জন্য বলে এসেছিলেন, কিন্তু কিছুতে সুবিধে করতে পারি নি এতদিন।

বিষম আমুদে এই মামি—দেখেছি তো আমাদের বাড়িতে! অবিরত পানদোক্তা খাবেন, আর গল্প…গল্প…সৃষ্টির লোকের সম্পর্কে এঁর আলোচনা। তাঁর এই ভাবান্তর—ঘণ্টা দশেক এসেছি, তা বোধ হয় দশটা কথাও বেরোয় নি মুখ দিয়ে।

মামি বললেন, মশারি সঙ্গে আছে ? নয়তো মশারি একটা কিনে আনো—

খুব মশা বুঝি ?

হরিনাথ তাড়াতাড়ি বললেন, আছে দু-দশটা। তা এত লোককে ভাগেযোগে খাচ্ছে—তুমি বিশেষ টের পাবে না—

দেখলাম, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। বলতে লাগলেন, কিনো মশারি—তা বলে এক্ষুণি ছুটে গিয়ে কিনতে হবে, তার কোন মানে নেই। কাল-পরশু যেদিন হোক—

আমি রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি ?

হরিনাথ বলেন, আমার জন্যে হয়েছে কি ? আমি দুটো-একটা দিন না হয় তারকদের ঘরে শোব—

ঘরে নয় তো—রান্নাঘরে যদি জায়গা করে দেয়, রান্নার পাট মিটে যাবার পরে—

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, আছ ক-দিন তোমরা ?

বিশ্রী লাগে প্রশ্নটা। ধুলো পায়ে আছি বললে হয়, এখনই বিদায়ের প্রসঙ্গ উঠাচ্ছেন। আর আমার বাড়ি কত যত্ন করেছিলাম। যাবার নাম করলে কত রকমে আটকাত সুলেখা—বুড়ো ঝিটা অবধি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে এই রেওয়াজ চিরদিন।

মশারির প্রয়োজন পরে শুনলাম সুলেখার কাছে। অত্যাবশ্যক বটে—হাতে পয়সার যত খাঁকতি থাক, সর্বাগ্রে ওটা চাই। মশার জন্য নয়—আবরুর জন্য। শিয়ালের গর্ত জাতীয় ঐ তো একটুকু ঘর—বুড়োমানুষ হরিনাথ ক-দিন এখানে-ওখানে শোবেন ? আলো নিভিয়ে অন্ধকার করেও অবশ্য আবরু রাখা চলে, কিন্তু রাতে বেরোবারও তো দরকার পড়ে কখনো কখনো। সে অবস্থায় এ-মশারিতে এক দল ও-মশারিতে আর এক দল শুলে কোন অবস্থায় কারো অসুবিধার কারণ ঘটে না।

অতএব মশারি কিনলাম। তার ফলে আর এক মুশকিল। এমনি তো ঘরে বাতাস ঢোকার পথ নেই—তার উপর মশারি টাঙিয়ে অসহ অবস্থা হল ছেলে ঘেমে ওঠে, একটু ঘুমোয় না, সমস্ত রাত্রি কান্নাকাটি করে।

কামরার অপর অংশ থেকে বাড়িওয়ালার গালিগালাজ শোনা যায়।

রাত দুপুরে বাজার বসিয়েছে বাঙালগুলো। যা না বাপু, নিজেদের রাজ্যি-পাটে চলে যা। আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেতে এসেছিস কেন? বেগুন বারো আনা সের, কাঁচা-লঙ্কা ছ-পয়সা ডজন—ওরা তো মরবেই, ঘটোৎকচের মতো আমাদের চেপে নিয়ে মরবে।

এর উপর মামিও যখন-তখন ফোড়ন দিচ্ছেন, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় তোমাদের। দেখে তো এসেছি—অঢেল জায়গা-জমি, দুধ-মাছ মানুষে খেয়ে পারে না—

সুলেখা বলে, যাবেন?

এই ধুন্ধুমারের মধ্যে থাকার চেয়ে সে বাপু অনেক ভাল। যা হবার হোক—পেটে খেয়ে আর পা মেলে শুয়ে তো বাঁচা যায়!

যান তাই। আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবেন। আমরা আপনার এই ঘরে থেকে যাই। পেটে না-ই বা জুটুক, রাত্রিবেলা নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাবে। আলো জেলে জেগে বসে থাকতে হবে না।

দিন দশেক কেটেছে কায়ক্লেশে। শেষে সুলেখারও বিতৃষ্ণা হল। বলে, সুবিধা করতে পারলে না কোন রকমে? তা হলে যাবার ব্যবস্থা দেখ।

ফিরে যাবে?

কি হবে দরজায় দরজায় অপমান কুড়িয়ে? ছেলেটার কি হাল হয়ে গেছে—রাতদিন গায়ে যেন জ্বর বইছে।

তাঁতের মাকু—ওদিকের ধাক্কায় এদিকে এসেছি, এদিকের ধাক্কায় ফিরতে হবে আবার ওদিকে।

হরিনাথকে বললাম, মঙ্গলবারে যাচ্ছি মামা—

একগাল হেসে তিনি বললেন, বেশ—ঘরের ছেলে ঘরে যাবে বই কি। কত কষ্ট পেয়ে গেলে। ঐ যে বলে, বারো-উপুসে গেলেন তেরো-উপুসের বাড়ি—তার মানে, একজনে বারো দিন না খেয়ে যে বাড়ি অতিথি হল তারা তেরো দিন

খায় না। এ-ও আমাদের সেই বৃত্তান্ত। নেহাৎ মাটি কামড়ে এক জায়গায় পড়ে আছি, তাই লোকে উদ্বাস্তু বলছে না।

মামিও শুনলেন। চলে যাচ্ছি শুনে অতিমাত্রায় সদয় হয়ে উঠলেন তিনি। সুলেখাকে বললেন, এসে দু-দিন মাস্তোর থাকলে, তা-ও কত খিচখিচ করেছি। আমার কপাল!

সুলেখা বিরক্ত তাঁর উপর। ভালোমন্দ কিছু না বলে সরে যাচ্ছিল—সহসা দরদর করে জল পড়তে লাগল মামির দু-চোখ দিয়ে।

চলে যাচ্ছ—খুলে বলি তা হলে। রেশনের চাল—কুলিয়ে ওঠা যায় না। উনি একবেলা উপোস করেন, আমি আর একবেলা। তুমি টের না পাও, তাই বকেঝকে রান্নাঘর থেকে তোমায় সরিয়ে দিতাম। রাগ হয় বিধাতাপুরুষের উপর, যিনি এমন ভাগ্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁকে পাওয়া যায় না—যাকে সামনের মাথায় পাই, তার উপরে ঝাল ঝাড়ি।

কিন্তু মঙ্গলবারে যাওয়া হল না। খোকার জ্বর বাড়ল। নিউমোনিয়া। সব শেষ হল চৌদ্দ দিনের দিন। যাবার পথে আর দুধ খাওয়াবার হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।

দেশের স্টেশনে পৌছলাম একেবারে ভারবোঝা-বিমুক্ত অবস্থায়। পকেট কুড়িয়ে সাকুল্যে আনা আষ্টেকও হবে না বোধ হয়। এখন এই পথটুকু কি করে যাব, সেই ভাবনা। আমি হেঁটে যেতে পারি, আমার কথা হচ্ছে না। কিন্তু কেঁদে কেঁদে সুলেখার চোখের কোণে দাগ হয়ে গেছে, ক-দিনে একবার উঠে বসে নি পর্যন্ত—তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়?

কয়েক পা এগিয়ে—অভাবিত ব্যাপার—সবেদ শেখ দেখি খালি গরুর গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। সবেদ আমায় দেখতে পেয়েছে।

ছোট বাবু না? ফিরে এলে? বাড়ি যাবে তো চটপট উঠে পড়ো গাড়িতে। তোমাদের ডাক্তার বাবুকে রেখে গেলাম।

ডাক্তার-দা ? তিনি কোথা যাচ্ছেন ?

সবেদ হেসে বলে, তুমি এলে যে জায়গা থেকে। মুখে অবিশ্যি বললেন, বউ ঠাকরুনদের বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন। তুমি আরও চালাক—আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লে, জবাবের দায় ঠেকতে হল না। আখেজ এই নিয়ে কত হাসি-মস্করা করেছে আমাদের পাড়ায়।

আমি বললাম, একটু দাঁড়াও সবেদ। তোমার বউমা প্লাটফর্মে রয়েছে, তাকে নিয়ে আসি।

সুলেখাকে আনতে গিয়ে টিকিটঘরের কাছে কিরণ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল।

ফিরে এলে—জুত হল না বুঝি ?

কিন্তু আপনি যে এত হম্বিতম্বি করতেন—

ডাক্তার উপদেশ দিলেন, তুমিও কোরো। যতক্ষণ আছ, মুখ-জোর থাকে যেন। নয় তো মারা পড়বে। তা-বড় তা-বড় নেতা—মুখে লম্বাচওড়া বক্তৃতা—তারপর ফাঁকমতো হিন্দুস্থানে পৌঁছে গিয়ে আবার সেখানকার মতো বলছেন। ঐ যে মামলা নিয়ে ছুটোছুটি করতাম—এখন বুঝলে তো ? মামলা না কচু—গোবরডাঙায় জমি খুঁজতে আসতাম।

গরুর কাঁধ থেকে গাড়ি নামিয়ে সবেদ তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এসো মা-ঠাকরুন। মালপত্তোর কই ?

কিছু নেই। সমস্ত নিয়ে নিয়েছে।

সবেদ মন্তব্য করে, ডাকাত বেটারা !

দু-তরফে নিল সবেদ। যাবার সময় এরা নিয়েছে। আবার সেখানে গিয়ে এটা-সেটা যা কিনেছিলাম, আসবার সময় তারা নিয়ে নিল। মানুষ ছেড়ে দেয়, মাল ছাড়ে না।

সবেদ আর একটি কথা বলল না। জিভে বিচিত্র আওয়াজ করছে—কটক। ঘরমুখো গরু দ্রুতবেগে ছুটল। অনেকটা পথ গিয়ে মাঠে পড়েছি।

নিম্নকণ্ঠে সবেদ বলল, খোকন ?

সুলেখা কেঁদে ফেলল।

গঙ্গায় দিয়ে এলাম তাকে।

বড়-আমতলা দিয়ে যাচ্ছে এবার গাড়ি। আমার আমগাছ, আমার ঐ তালগাছ···আমার চিরকালের চেনা ভাঙা-ঘাটওয়ালা পুকুর, তারিপ ফকিরের মসজিদ ঐ পাশে। ছোটবেলা থেকে এইসব দেখে আসছি, ঘাসের গুচ্ছটিও চেনা-জানা আমার···

সন্ধ্যা হয়েছে। কেদার সাধুখাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছি। বুড়ো কেদারের বাঁ হাতে লাঠি, ডান হাতে প্রদীপ—কাঁপুনি রোগ আছে—কাঁপতে কাঁপতে সে তুলসীতলায় গোলার ভিটেয় সন্ধ্যে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

একবার অনেক দিন আগে রাত দুপুরে খুব চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছিলাম এই বাড়ি। চোর এসেছিল, চোরটাকে কেদার জাপটে ধরেছে। বিশালকায় চোর—নিরস্ত্রও নয়, গাছ-কাটা দা আছে সঙ্গে। তবু লোকজন এসে পড়বার আগে একাই কেদার কায়দা করে ফেলেছে। সকলে এসে পড়লে চোরকে বেঁধে রাখা হল খুঁটির সঙ্গে।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কেদার তামাক ধরিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এই তো লিকলিকে মানুষ তুমি কেদার—ঐ অসুরের সঙ্গে পেরে উঠলে কি করে?

কেদার অতি সংক্ষেপে বলেছিল, আমার বাড়ি না ওর বাড়ি?

সবেদকে জিজ্ঞাসা করি, ঘর-দোর ঠিক আছে?

সরল অমায়িক হাসি সবেদের মুখে।

না থাকে, আমরা সকলে তো আছি ছোটবাবু—

আ মরি বাংলাভাষা!

একটা বানান ভুল নিয়ে বিপত্তি। নারায়ণ চৌধুরি গ্রামে এসেছেন। স্ত্রী তরঙ্গিণীর ব্রত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ফলাহারের নিমন্ত্রণ—এই 'নিমন্ত্রণ' কথাটায় দুই 'ণ'-এর গোলমাল ঘটেছে।

চিঠি নিয়ে এসেছিল চৌধুরি মশায়ের ভাগনে বলাই। শ্রীকণ্ঠ কটমট চোখে তার দিকে তাকালেন।

লিপিকার কোন্ পণ্ডিত হে?

এমন সাধু উক্তি বোঝবার বুদ্ধি ও বয়স বলাইর নয়। সভয়ে সে বলে, আজ্ঞে?

কিছু না। প্রশ্নটা চৌধুরি মশাইকে করব। আজকেই সাক্ষাৎ করব, তাঁকে বোলো।

পাঠশালার ছুটির পর শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত চৌধুরির বৈঠকখানায় হাজির হলেন। এ ঘর বন্ধ থাকত—ইদানীং ফরাশে ধবধবে বিছানা, দেয়ালে বিলম্বিত ছবি—

ছবিগুলার দিকে নজর পড়ে শ্রীকণ্ঠর মুখ কঠিন হল। থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

নারায়ণ চৌধুরি সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন, বসতে আজ্ঞা হয় চক্কোত্তি মশায়—

নিমন্ত্রণ-চিঠি বের করে ধরে শ্রীকণ্ঠ বললেন, মাতৃভাষা লোকে তো মাতৃগর্ভ থেকেই শেখে। আপনি এত বিলাতি বিদ্যা অর্জন করেও এই একটা সাধারণ বানান ভুল করে বসলেন কি করে?

নারায়ণ ইতিমধ্যেই শ্রীকণ্ঠের অনেক কথা শুনেছেন। তিনি লজ্জিত হলেন না। বললেন, সেই কবে ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগে বানান

মুখস্থ করেছিলাম। তারপরে দু-পাঁচটা বই পড়া ছাড়া ভাষার তো বিশেষ চর্চা হয়নি—

বই ওঁদেরই তো? বোঝা গেল। সুস্থ লোককে ক্ষিপ্ত করে দেয়। আপনার দোষ নেই মশায়।

বিষম আশ্চর্য হয়ে নারায়ণ প্রশ্ন করলেন, কাদের কথা বলছেন?

দেয়ালের ছবির দিকে নির্দেশ করলেন শ্রীকণ্ঠ। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ। নিশ্বাস ফেলে বললেন, বিদ্যাসাগর মশায়ের পর আর কেউ বাংলা লিখল না। ওঁরাই সব উদয় হয়ে ভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ করে গেছেন।

নারায়ণ বললেন, গোটা বাঙালি জাতের শ্রাদ্ধের যোগাড় হচ্ছে, সে খবর রাখেন? ক'দিন আর পড়াবেন বাংলা? আখের বাঁচাতে চান তো চটপট হিন্দি শিখে ফেলুন।

আমি? শ্রীকণ্ঠ ভ্রূকুটি করলেন। বিমাতাকে 'মা' বলতে হবে সেই ঘেন্নায় মশায় ছেলেবয়সে মুলুক ছেড়েছিলাম। আপনি অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি—আপনার কর্তব্য হচ্ছে, নির্ভুলভাবে সর্বাগ্রে মাতৃভাষা শিখে নেওয়া।

নারায়ণ হাসতে লাগলেন।

এ বয়সে আর সম্ভব হবে না চক্কোত্তি মশায়। ছেলেপুলে যদি থাকত, তাদের দিয়ে আত্মক্রটি শোধরাতাম। সে তো ভগবান দেন নি! বলাই আপনারই কাছে আছে—দেখুন, ওকে যদি পারেন শেখাতে।

পণ্ডিত কতকটা শান্ত হয়ে বললেন, তা পারব। কেন পারব না? মাইকেল-বঙ্কিম স্কন্ধে ভর করেন নি, নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধি—ওদের শিখানো অনেক সহজ আপনাদের চেয়ে।

মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের অপদৃষ্টান্তে অন্যত্র দুর্গতি ঘটলেও বাংলার প্রত্যন্তবর্তী এই গ্রামে শ্রীকণ্ঠের প্রহরায় ব্যাকরণদুষ্ট ভাষা বলে কারো পরিত্রাণ নেই। শ্রীকণ্ঠ চক্রবর্তী—ইয়া দশাসই চেহারা—বড় আটচালা ঘরে পাঠশালা, দাওয়ায় উঠতে তবু মাথা নিচু করতে হয়—এতটা লম্বা তিনি। সর্বদা খাড়া হয়ে চলেন—অত্যধিক লম্বা হওয়ার দরুন মনে হয়, অনেক উঁচু থেকে তাকাচ্ছেন

সকলের দিকে। কণ্ঠস্বরে শঙ্খের আওয়াজ পাওয়া যায়। পাঠশালার পণ্ডিত—কিন্তু ভাবখানা যেন সর্বশক্তিমান রাজ-রাজ্যেশ্বর তিনি। এখানে যত বাঙালি অধিবাসী আছে, তাঁর বিক্রমে সকলে তটস্থ। বুনো বলে, এক জাত আছে—অরণ্য-অঞ্চল থেকে এসে বসতি করেছে কোন আদিকালে। বাংলা কথা তারাও বলে, তবে উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ। এই ত্রুটি শ্রীকণ্ঠ অসীম উদ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করেন, যখনই তাদের কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

বৈশাখের মাঝামাঝি। নিদারুণ গরম। শ্রীকণ্ঠের হাই উঠছিল। বললেন, গোপালের গল্পটা লেখ্ তোরা আগাগোড়া। লিখে লিখে রপ্ত কর্। বাড়ির ভিত যে রকম দুরমুশ করে। নইলে হেঁ-হেঁ—মাইকেল মধুসূদন হতে হবে কিন্তু, 'গায়কের' স্ত্রীলিঙ্গে লিখবি 'গায়কী'।

জলচৌকির উপর বসেছেন তিনি। ছেলেরা বই খুলে শেলেটে লিখছে। মুখেও বলে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ক্রমশ চোখ বুঝলেন শ্রীকণ্ঠ—বাঁশের খুঁটি ঠেস দিয়ে ঘুমোতে লাগলেন। অনেক দিনের পরিপাটি অভ্যাস—এদিক-ওদিক সরে পড়েন না। সরু খুঁটির সঙ্গে দেহ যেন এঁটে আছে।

যতীন গিয়ে ডাকে, পণ্ডিত মশায়—

শ্রীকণ্ঠ চমকে তাকান। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, লিখতে বললাম যে!

লেখা হয়ে গেছে।

পণ্ডিত নিদ্রারক্ত চোখ দুটো স্থাপন করলেন তার দিকে। যেন দো-নলা বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছেন।

এরই মধ্যে হয়ে গেল? গণেশের কলম পেয়েছিস? দেখি—

একটানে শেলেটখানা যতীনের হাত থেকে নিলেন। এবং যা ভাবা গিয়েছিল, লাইন তিনেক পরেই মারাত্মক কাণ্ড—'কিন্তু'তে দীর্ঘ ঈ-কার।

ক-য়ে দীর্ঘ-ঈ কী লিখছিস—রবিঠাকুর হলি নাকি বেটা? আয়, কাছে চলে আয়—

স্বেচ্ছায় কাছে আসা পর্যন্ত সবুর করলেন না, কান ধরে টেনে আনলেন।

দীর্ঘ ঈ-কারান্ত কীন খা এবার—উ?

সুপ্রচুর বর্ষণের পর সকলের দিকে একে একে অগ্নিদৃষ্টি বুলিয়ে শ্রীকণ্ঠ বললেন, যা বললাম—ধরে ধরে লেখ্ তোরা। খারাপ হলে মুছে আবার গোড়া থেকে লিখবি।

বলে খুঁটিতে ঠেস দিলেন। নড়েচড়ে পা ছড়িয়ে বসলেন এবার।

ছেলেরা বুঝে নিয়েছে, বিদ্যোৎসাহ দেখাতে গেলে যতীনের অবস্থা হবে। গল্পগুজব করছে—নিম্নকণ্ঠে, পণ্ডিতের কানে পৌঁছে ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়। শেলেটের উপর ছক কেটে ছোট ছোট ঢিল নিয়ে বাঘ-ছাগল খেলছেও কেউ কেউ।

এমন নিরালা দুপুরটা চৌদেয়ালের মাঝে কাটানো বলাইর অসহ্য লাগছে। মামা তাকে এ কি বিষম বিপদে ফেললেন! তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল।

তেষ্টা পেয়েছে পণ্ডিত মশায়—

শ্রীকণ্ঠ গভীর ঘুমে অচৈতন্য। কে শুনছে? ধর্ম তরিয়ে বলাই বেরুল।

পাঠশালা-সংলগ্ন খেলার মাঠের ওধারে দীঘি। ঘাট বাঁধানো, তকতকে জল। ইদানীং কিছু কিছু শেওলা জমেছে পাড়ের কিনারে। তৃষ্ণা পেলে ছেলেরা ঘাটে গিয়ে আঁজলা ভরে ভরে জল খেয়ে আসে।

জল খেতে গিয়ে আর এক মতলব মাথায় এল। জল না খেয়ে জামরুল খেলে হয়। থোলো থোলো সুপুষ্ট জামরুল ফলে আছে, ফলের ভারে ডাল ভেঙে পড়ে বুঝি বা! অতএব তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য সে ঘাটে নামল না, গাছের মাথায় চড়ল। মনের সাধে খাচ্ছে। খাওয়ার শখ যখন মিটে গেল, একখানা দোডালায় আধশোয়া ভাবে সে আয়েশ করে বসল। অন্য কাজের অভাবে জামরুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাতের টিপ ঠিক করছে। ঐ যে কলমিফুল ফুটেছে, মারবে ঐখানটায়—কিংবা ঐ হলদে পাখী বসে আছে দক্ষিণ পাড়ে আমগাছের ডালে···

ছেলেদের এক একজন বাইরে আসছে। অমনি বলাই পাতার মধ্যে মিশে যায়—নড়াচড়া নেই। ওদের আসা-যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, শ্রীকণ্ঠের

এখনো ঘুম ভাঙে নি। মহানন্দে তার গান ধরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেটা উচিত নয়—এই গোপন রাজাসনের খবর বাইরে জাহির করা ঠিক হবে না।

যতীন আসছে, হাতে শেলেট। শেলেট ধুতে এসেছে সে। ভিজে শেলেট সূর্যের উল্টো দিকে ধরে নাড়ছে, আলো ঠিকরে পড়ছে। এই এক মজার খেলা। চেষ্টা করছে, আলো যাতে পাঠশালা ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ে। অত দূর পৌঁছাল না—অত দূরে যেতে আলোর ঔজ্জ্বল্য থাকে না একটুও।

জামরুলতলায় এলে এক থোলো জামরুল পড়ল ঠিক তার সামনে। পড়াশুনায় ভাল, কিন্তু এমন আহাম্মক যে একটু সন্দেহ জাগল না—যেন স্বাভাবিক ভাবে পড়েছে এমনি ভাবে কুড়িয়ে খেতে খেতে সে চলল।

হুঁ-উ-ম্— পেঁচা ডেকে উঠল এবার বলাই।

যতীন উপরে তাকাল। বাঁ হাতে একটা ডাল ধরে ঝুঁকে পড়ে বলাই ডাক দেয়, জামরুল খাবি তো উঠে আয়।—'

যতীন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

এইটুকু গাছে উঠতে পারবি নে? ধ্‌স্!···দাঁড়া, আমি পেড়ে দিচ্ছি, খেয়ে যা।

না—বলে যতীন চলে যাচ্ছিল। বলাই ঠাট্টা করে বলে, কিল খেয়ে পেট ভরে গেছে বুঝি?

ভাল দেখে কয়েকটা ফল সে ফেলল। শ্রীকণ্ঠের কাছে মার খাওয়ার দরুন যতীনের প্রতি সহানুভূতি জেগেছে। বলে, পণ্ডিত জাগলে আমায় জানিয়ে দিস। চেঁচিয়ে বলবি, কুকুরে জুতো নিয়ে গেল—তাই থেকে বুঝে নেব। পাকা পাকা অনেক জামরুল ভাঁটবনে তোর জন্যে রেখে যাবো—ছুটির পর এসে খাস।

তারপর কাঠবিড়ালির মতো এ-ডাল ও-ডাল বেড়িয়ে নিঃশব্দে সে কোঁচড় ভরতে লাগল।

যতীনকে আবার আসতে দেখা গেল। একা নয়—সঙ্গে জন পাঁচ-ছয়। বোকারাম গিয়ে গল্প করেছে বুঝি, দল বেঁধে ওরা জামরুল খেতে আসছে। গাছ মুড়িয়ে খেয়ে যাবে।

যতীন বলছে—শোনা গেল—পালিয়ে গেছে কিনা কে জানে?

হাবুল বলে, ধরে নিয়ে যেতে না পারলে উল্টে আমাদেরই পিটুনি খেতে হবে পণ্ডিত মশায়ের কাছে। কেন তুই লাগাতে গেলি যতীন?

রাগে বলাইর ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা করে। আতিথেয়তা দেখাতে গিয়ে এই সর্বনাশ। দাঁতে দাঁত চেপে সে গর্জায়, হারামজাদা!

হাবুল ডাকে, নেমে আয় রে বলাই। পণ্ডিত মশায় ডাকছেন।

জবাবে কোঁচড়ের বড় এক জামরুল তাক করে মারল যতীনকে। অব্যর্থ লক্ষ্য—ডান চোখের উপর লাগল। চোখে অন্ধকার দেখল—আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে সে পড়ে গেল। তারপরে মুষলধারে জামরুল-বৃষ্টি। রণে ভঙ্গ দিয়ে ছেলেরা চেঁচাতে চেঁচাতে পালাল।

শ্রীকণ্ঠ নিজে ছুটতে ছুটতে এলেন। চৌধুরিদের রাখাল ছোকরা পাচনবাড়ি ভর দিয়ে হি-হি করে হাসছে। বলে, ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে রামদৌড় দিয়েছে। কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে গেছে এতক্ষণে—নাগাল পাবে না।

সেই যে পালাল, আর খবর নেই। যেন কর্পূর হয়ে উবে গেছে গ্রাম থেকে। তরঙ্গিণী এদিকে নারায়ণের উপর ক্ষণে ক্ষণে হুমকি দিয়ে পড়ছেন, তোমরা আদা-জল খেয়ে লাগলে ছোঁড়াটাকে বাংলাবাগীশ করতে। পড়ার ভয়ে বিবাগী হল। কোথায় গেল—খোঁজখবর করে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

নারায়ণও পণ্ডিতকে বলেন, কেন অত তাড়াহুড়ো করেন চক্কোত্তি মশায়? কি দরকার? মেয়েরা বাংলায় চিঠিপত্তোর লিখত কি একটা বাংলা নভেল হাতে করে ঘুমুতো দুপুরবেলা। বাংলার এ ইজ্জতটুকুও তো আর থাকছে না।

এঁদের এই সব ভীতির কথা ইদানীং কতকটা বিশ্বাস হচ্ছে শ্রীকণ্ঠর। স্বচক্ষে দেখলেন, স্টেশনের বাংলা নাম মুছে অবোধ্য অক্ষরে নূতন করে লিখে দিয়ে গেল। দামোদরের পুল পেরিয়ে তেমাথার উপর হাত-আঁকা সাইন-বোর্ড ছিল—হাতের নিচে লেখা 'পুরুলিয়া'। সাইন-বোর্ডটা ভেঙে দিয়ে গেছে বাংলা অক্ষর সংযোগদুষ্ট হওয়ার দরুনই সম্ভবত।

এক রাত্রে খোদ শ্রীকণ্ঠ চক্রবর্তীর বাড়ি চোর এল। রান্নাঘরে ঘটি-বাটি-কলসি ছিল, কিছু ছোঁয় নি—হাঁড়ি থেকে কিছু পরিমাণ পান্তাভাত বেড়ে নিয়ে শুধু মাত্র নুন সহযোগে খেয়ে গিয়েছে। এঁটো থালাখানা পড়ে আছে।

নারায়ণ তরঙ্গিণীকে বললেন, খোঁজ পেলে তো এবার? চুপচাপ থাকো। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—'বাপ' 'বাপ' করে এসে পড়বে। তখন পাঠশালে কেন—ঢেঁকিশালে চৌপহর ধান ভানতে বললেও তাই করবে।

আরও তুটো দিন কেটেছে।

সে রাতে চৌধুরিবাড়ি রান্নার বড় ধুম। তরঙ্গিণী রুইমাছের মুড়োর তরকারি রাঁধলেন, কিসমিস দিয়ে পায়স রাঁধলেন। ভাত-তরকারি পরিপাটি রূপে সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে আলগোছে দরজা ভেজিয়ে রাখলেন। নারায়ণ শুয়ে পড়েছেন, তরঙ্গিণী তাঁকে ডাকেন নি। ডেকে তুলবেন ফাঁদে যখন শিকার পড়বে। ফাঁদে পড়বেই, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ তিনি। সেই পান্তাভাত চুরির পর থেকে গ্রামের মানুষ সাবধান হয়ে গেছে; পুরো তুটো দিন ও এক রাত্রি অতএব বলাইর ভাত জোটে নি। আর তরঙ্গিণীও সকলকে জানান দিয়ে পায়স রেঁধেছেন, রান্নার গন্ধে পাড়া আমোদিত হয়েছে।

পাশের ঘরে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। আলো নেভানো—আলো জ্বালা দেখলে চোর ঢুকবে না।

ঘুমের আবিল এসেছিল, ধড়মড়িয়ে খাড়া হলেন। এসেছে। বাটির উপর রেকাবি ঢাকা ছিল, অসাবধানে ফেলে দিয়েছে ঝনঝন করে। উঠে টিপিটিপি তুয়োরের ধারে এলেন। মহানন্দে খানাপিনা করছে, শব্দসাড়ায় টের পাওয়া গেল।

শিকল লাগিয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি। আর কি—পালাবে কোথা? শিকল দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। নারায়ণকে জাগিয়ে তুলে হ্যারিকেন জ্বেলে আবার এলেন। মুখরা তরঙ্গিণী সবুর মানেন না, আগে থেকে বকতে লেগেছেন, কি ডাকাত ছেলে রে বাপু! যতীনটাকে তো নিমখুন করলি। হাতে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাবে, তখন টের পাবি মজা।

সন্তর্পণে শিকল খুলে আলো উঁচু করে দেখলেন। পাড়ার নেড়ি-কুকুরটা পায়েসের গন্ধে রান্নাঘরে ঢুকেছে।

পাঠশালায় নূতন পণ্ডিত আসছেন, চিঠি এসেছে। চিঠি পড়ে নারায়ণ মর্ম বুঝিয়ে দিলেন।

শ্রীকণ্ঠ বললেন, হিজিবিজি চীনে অক্ষরে লিখেছে। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গেলেন যে চৌধুরি মশায়!

চীনে নয়, দেবনাগরি—

এক বর্ণ বোঝা যায় না—নাগরি বলুন, চীনে বলুন—একই বস্তু আমার কাছে।

নারায়ণ বললেন, এই হরপে এখন থেকে লেখাপড়া হবে। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেল।

শ্রীকণ্ঠ বললেন, লোষ্ট্রভাষা। মুখের ভিতর ঢিল পুরে হুঁ-হ্যাঁ করলেই হিন্দি হয়ে যায়।

একটু চুপ করে থেকে নিশ্বাস ফেলে বললেন, দেশে ঘরে চলে যাব এবারে মশায়। চল্লিশ বছরের আস্তানা উঠল।

পূর্ববঙ্গে শ্রীকণ্ঠর বাড়ি। সতের বছর বয়সে খুড়োর সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন। সেই থেকে আছেন।

নারায়ণ বললেন, ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর চক্কোত্তি মশায়। সেখানেও জুত নেই। সেখানে আরবি হরপ। সে আরও হাঙ্গামা—ডান দিক থেকে লিখতে হয়।

শ্রীকণ্ঠ বিরসমুখে বললেন, ত্রিভুবনে কোথাও বাংলার স্থান নাই? বঙ্গভাষা ভুলে যেতে হবে তা হলে?

হাহাকারের মতো শোনাল।

নারায়ণ বললেন, বিচলিত হবেন না পণ্ডিত মশায়। সরকারি পাঠশালায় নতুন পণ্ডিত আসুন গে। আপনি আমার বৈঠকখানায় পড়াবেন। বাংলা পড়ুয়ারা সেখানে এসে জুটবে।

কিন্তু শ্রীকণ্ঠ প্রবোধ মানেন না।

সমস্ত হিন্দি হয়ে গেল? গরু-বাছুর হিন্দিতে হাম্বা করবে মশায়? শালিক-ময়নাও বাংলা বুলি বলতে পারবে না—হিন্দি কপচাবে?

বলাই ধরা পড়ল। যতীনের বোন চপলা এক ছড়া মর্তমানকলা চুরি করে ঘোষালদের পরিত্যক্ত গোলার পাটায় বসে বসে খাচ্ছিল। কতকগুলো খেয়ে নাটাবনে গুঁড়ি মেরে বসে সে নাটা কুড়োচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, বাকি কলাগুলো এক ছিদ্রপথে গোলার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। উচ্চবাচ্য না করে চপলা চলে গেল। এবং তরঙ্গিণীর সঙ্গে ফিরে এল অনতিপরেই।

জাত্‌-কেউটে কিলবিল করে বেড়ায়, ওর মধ্যে গিয়ে জুটেছিস? গলায় দড়ি দেবো আমি তোর জ্বালায়—

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ভাল চাস তো বেরিয়ে আয়।

জবাব নেই।

বেরিয়ে আয় বলছি। নয় তো আগুন জ্বালিয়ে দেবো গোলায়—

এ উপায়ে হবে না দেখে অতি কোমলভাবে তরঙ্গিণী ডাকতে লাগলেন, বেরিয়ে এসো বাবা। আর পড়তে পাঠাব না।

কক্ষণো না? কোনদিনও না?

উঁহু—

মামা কি শুনবেন?

তরঙ্গিণী অধীর হয়ে বললেন, যাতে শোনেন তাই আমি করব। তিনি বাড়ি নেই। নেয়ে খেয়ে ঠাণ্ডা হ বাইরে এসে। ভাল না লাগে, চলে যাস তখন যে চুলোয় খুশি।

বারংবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে বলাই গোলার সঙ্কীর্ণ দরজা টপকে বেরিয়ে এল। পরিতুষ্ট হয়ে ভাত খেল কতদিন পরে। আঁচাতে বেরিয়ে দেখে, দরজার ওপাশে পিঁড়ি পেতে নারায়ণ বসে বিড়ি টানছেন। বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে তিনি বলাইর হাত এঁটে ধরলেন।

তোর মামি জল ঢেলে দিচ্ছে। এ হাত আমার ধরাই থাকবে।

আরও দেখা গেল, অদূরে যতীনরা। বলাইর চোখ ফেটে জল আসবার মতো হল। সবাই বিশ্বাসঘাতক এ সংসারে? মামিমা অবধি?

দুটি ছেলে দু-হাত ধরে বলাইকে নিয়ে চলল। শান্ত ভাবে যাচ্ছে বলাই। দম আটকে থাকছে খানিকক্ষণ, তারপর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। পৌঁছানো মাত্রই কি কাণ্ড শুরু হবে সে জানে। পিটুনির সময় দম ধরে থাকলে ব্যথা কম লাগে, এটা তার বহু-পরীক্ষিত। তারই মহলা দিতে দিতে যাচ্ছে।

পাঠশালা-ঘরে তুলে দিয়ে যতীনরা হাত ছাড়ল। বাঘের মুখে ছাগল এনে ফেলে গলায় দড়ি রাখা আর নিষ্প্রয়োজন।

বলাই নিজের জায়গায় যায় না, শ্রীকণ্ঠর দিকে এগিয়ে আসে। পাওনা-গণ্ডা চুকে যাক, তখন জায়গায় যাবে। অবশ্য যদি তখনও হেঁটে গিয়ে জায়গায় বসবার সামর্থ্য থাকে।

কিন্তু শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিতের ভাবগতিক আজ বিচিত্র। ছেলেরা দেয়াল ঘেঁষে নির্বাক পুতুলের মতো বসে। শ্রীকণ্ঠ দু-হাতে পিছন দিকে বেতের দুই প্রান্ত সজোরে মুঠো করে ধরে পদচারণা করছেন। দৃষ্টি পর্যায়ক্রমে সকলের উপর পড়ছে, কিন্তু কোন-কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি যেন।

বলাই কাছে যেতে বললেন, বোস্। তার এত বড় অপরাধ বিস্মৃত হয়ে গেলেন নাকি?

একটা ছেলে বলে, ঘোর হয়ে এল। আমাদের লেখা দেখবেন কখন?

পণ্ডিত সহসা যেন সম্বিৎ পেলেন।

তাই তো! পাঁচটা বেজে গেছে—না? মানে মানে সরে পড়ি চল্ এবার। খাতা দেখব চৌধুরি মশায়ের বৈঠকখানায়। আয়।

পণ্ডিতের পিছনে পিছনে চলেছে ছেলেরা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। খেলার মাঠের উপর এসে শ্রীকণ্ঠ পিছন ফিরে দেখলেন একবার। বললেনঃ আর আসব না।

মিটমিট করে কেরোসিনের দেয়ালগিরি জ্বলছে। আধ-অন্ধকার বৈঠকখানা। বয়স্কদের অনেকে এসেছে সেখানে। সবাই সমদুঃখী। এক মহা-শোকের ছায়াতলে এসে দাঁড়িয়েছে প্রবীণ ও নবীন বিপন্ন বাঙালি-মানুষ। চাপদাড়িওয়ালা কৃষ্ণাঙ্গ আসগর মিঞা নারায়ণ বলছিলেন, অন্যায় হয়ে গেছে চৌধুরি মশায় বাংলাটা ভাল করে না শেখা কিছু হবে বলতে পারেন এই ক-দিনের মধ্যে? প্রশস্ত-ললাট মুণ্ডিত-শ্মশ্রু নারায়ণ চৌধুরির চেহারায় দেয়ালের বিদ্যাসাগর-প্রতিকৃতির আদল আছে—আজকে হঠাৎ মনে হল শ্রীকণ্ঠর। আসগর মিঞার মুখও কতকটা বুঝি মাইকেলের মতো! অস্পষ্ট আলোয় আরও মনে হচ্ছে, ছবির ফ্রেম থেকে নেমে এসে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ ম্লান মুখে সকলের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন ভাষা ও সাহিত্যের এই পরম দুর্দিনে। শ্রীকণ্ঠ চিরকাল অকথা-কুকথা বলে এসেছেন এঁদের সম্পর্কে, আজকে সজল চোখে নমস্কার করতে ইচ্ছে হচ্ছে বারংবার। অকুণ্ঠ বিশ্বাসে সাধনার ধন তোমরা উত্তরপুরুষদের সমর্পণ করে অতীত হয়েছ—দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের সকল সৃষ্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে? ভবিষ্যতের ভাষাতাত্ত্বিক পুরানো পুঁথিশালা খুঁজে বের করবেন, বাংলা নামক এক বিলুপ্ত ভাষার দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন। কত অনামি গ্রামকবি ছড়া রচে বন্দনা করেছেন বঙ্গ-সরস্বতীর! কত প্রেমিক মিঠা বাংলায় প্রেমগুঞ্জন করেছেন প্রিয়ার কানে, বিম্বাধরা প্রিয়তমা কপট তর্জনে তার উত্তর দিয়েছে! মা-মা—বলে ডেকেছে শিশুরা; লক্ষ্মীমণি, সোণামণি—ছুটে এসে আদর করেছে মা শিশুদের! কালের সঙ্গে হায় নিঃশেষিত সমস্ত কাকলী!

গ্রামের এই ছোট-বড়দের ভিড়ের মধ্যে এসেছেন বুঝি অলক্ষ্যে যাঁরা যশস্বী, আর যাঁরা নগণ্য। যাঁরা লিখে গেছেন, যাঁরা ভেবে গেছেন, আর যাঁরা শুধু বাংলা কথা বলে গেছেন মনের আনন্দে। সেকালের বাঙালি আর একালের বাঙালি স্বল্পালোকিত কক্ষে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে গভীর দুঃখে এক হয়ে আছেন।

শ্রীকণ্ঠ বললেন, কেউ মন দিয়ে বাংলা পড়ানো শুনতে না। নিষ্ঠা ছিল না কারো। পাগল বলে মনে মনে আমায় বিদ্রূপও করেছ।

আর করব না পণ্ডিত মশায়—

শ্রীকণ্ঠ বলতে লাগলেন, আমারও অবহেলা ছিল। কত ফাঁকি দিয়েছি! ঘুম এসে গেছে পড়াতে পড়াতে—

অশ্রুবিন্দু চোখে নয়—মুখ দিয়ে আজ যেন বাংলা কথার সঙ্গে নিঃসৃত হচ্ছে সকলের।

আশ্চর্য, পাঠশালা শুরু হল চৌধুরির বৈঠকখানায়। ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো হয়েছে দেয়ালে, মেজেয় কতকগুলো মাদুর। পাঠশালার পরমায়ু চারটে দিন মাত্র—সোমবার শ্রীকণ্ঠ চলে যাবেন তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। অসুরের বল এসেছে বৃদ্ধের গায়ে, অবিরত পড়িয়ে ও লিখিয়ে চলেছেন। খড়ি দিয়ে দ্রুতবেগে বর্ণমালা লিখছেন বোর্ডের উপর—ক-খ-গ-ঘ। খটাখট জোর কদমে ঘোড়া ছুটেছে যেন। সময় নেই—মাত্র চার দিন। শ্রীকণ্ঠর কাজ শেষ—চল্লিশ বছর পরে তাঁর বাসায় ছেঁড়া-সতরঞ্চি ও বাক্সপেঁটরা গোছানো হচ্ছে।

বলাইর দু-চোখ ছাপিয়ে জল আসে। হেলায় নষ্ট করেছে এই দুটো মাসের মূল্যবান সময়। কেন সুমতি হয় নি? ব্ল্যাকবোর্ডে-লেখা অক্ষরগুলো এক রহস্যময় রাজ্যের বেড়ার মতো বোধ হচ্ছে। কি কৌশলে ঐ বেড়া টপকে ভিতরে প্রবেশ করবে? সময় মাত্র চারটে দিন। সশব্দে আবৃত্তি করে প্রাণপণ চেষ্টায় সে বর্ণমালা আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছে—

ক-খ-গ-ঘ—

দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ এক পুরুষ ঢুকলেন। সকলে তটস্থ। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল অনেকে। শ্রীকণ্ঠ আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন, কোন সম্ভাষণ করলেন না। ছেলেদের বললেন, থামলে কেন তোমরা? পড়ো—

লোকটি আত্মপরিচয় দিলেন, আমার নাম গঙ্গানারায়ণ বর্মা। পাঁচটার ট্রেনে এসেছি।

শ্রীকণ্ঠ তবু কিছু বললেন না, প্রাণ ঢেলে পড়াচ্ছেন। তদ্গত হয়ে শুনছেন

গঙ্গানারায়ণ। শেষে বললেন, আমিও পড়তে এসেছি। অবসর পেলেই আপনার পায়ের কাছে এসে বসব।

ব্যঙ্গের মতো শোনাল কথাগুলো। শ্রীকণ্ঠ তাঁর মুখে তাকালেন। না—যা ভেবেছেন, তা তো নয়! ছাত্রোচিত বিনয় সে মুখে।

তবু দ্বিধান্বিত স্বরে শ্রীকণ্ঠ বললেন, রাষ্ট্রভাষার মালিক আপনারা। সরকার আপনার পক্ষে—আপনি বাংলা শিখবেন কোন দুঃখে মশায়?

মালিক তো সকলেই আমরা। মুখ ফিরিয়ে থাকলে পরাজয় হবে। ঝাঁপিয়ে পড়ুন। মহা-ভারত যদি গড়তে হয়, মহাভাষা চাই তার জন্যে।

একটু স্তব্ধ থেকে গঙ্গানারায়ণ বলতে লাগলেন, হিন্দি নামে যার চলন, আহিমাচল-কুমারিকার চিন্তাধারণ অসাধ্য তার পক্ষে। সে ভাষা এখনো একেবারে কল্পনার মধ্যে। তার সৃষ্টি করব আমি, আপনি, ভাষা-সাধক যে যেখানে আছে সকলেই। হিন্দি বা যে নামই হোক, কিছু যায় আসে না।

শ্রীকণ্ঠ পরম বিস্ময়ে গঙ্গানারায়ণের দিকে তাকালেন। নূতন আশ্বাস কানে এল। আপোষেই হার মেনে নিচ্ছি কেন? বাংলাভাষার অতুল শক্তি-সমৃদ্ধিতে দখল করে ফেলব রাষ্ট্রভাষা। নাম? সত্যিই তো—নামে কি যায় আসে?

বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ—জয় হোক পূর্বসূরিদের!

কুম্ভকর্ণ

শম্ভু আমার সহপাঠি। কাজেম পণ্ডিতের পাঠশালায় একসঙ্গে তালপাতা লিখেছি, এক সুরে কড়াকিয়া বুড়িকিয়া আবৃত্তি করেছি। রাঙা ঘুনসিতে বুনট-করা দড়া-হারের মতো একটা জিনিস সে গলায় পরে থাকত—ইমান আলি ফকিরের মন্ত্রপূত তাগা। ভূত-প্রেত চোর-ডাকাত সাপ-শুয়োর কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ এই তাগা ধারণ করা আছে দেহে। আমার কাছে শম্ভু অনেকবার ঐ তাগার অসামান্য গুণ বর্ণনা করেছে, প্রলুব্ধ করেছে আমায়। ইচ্ছে হয়েছে, নিকারির বাঁধাল পার হয়ে ফকিরের থানে চলে যাই একদিন, গিয়ে তাগা নিয়ে আসি। পয়সাকড়ির খাঁই নেই ফকিরের, যে যা ইচ্ছে করে দেবে তাই নেবেন। ঝাড়ফুঁক করেন, জলপড়া দেন, তাগা দেন। দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ আসে। রান্নাবান্নাও করতে হয় অনেকের, সেজন্য ফকির এক লম্বা দোচালা বেঁধে দিয়েছেন। নূতন পুকুর কেটে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। দোকান-পাট রয়েছে পুকুরের ধারে উঠানের পূর্ব-সীমানায়। কোন অসুবিধা নেই। দোকান থেকে হাঁড়ি-চাল-ডাল কেনো, প্রচুর বাঁশ ও কাঠ চেলা করে বোঝাই দেওয়া আছে—ইচ্ছা মতো নিয়ে উনুন ধরাও, রান্না করো, খাও-দাও থাকো। যতদিন ইচ্ছা থাকতে পার, কেউ কিছু বলবে না। এমন কি প্রতি শুক্রবার জুম্মা-নমাজের পর হিন্দু-মুসলমান সর্বশ্রেণীর অতিথি-অভ্যাগতের মধ্যে বাতাসা-বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে ফকিরের নিজের খরচে।

একটা ব্যাপার আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করেছি—শম্ভু আশ্চর্য রকম মার খেতে পারত। ফকিরের তাগার গুণেই সম্ভবত। যত মারই মারো, কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করত না। পড়াশুনো সম্পর্কেও অবিকল এই রকম।

দু-বছর অবিরাম নামতা পড়িয়ে দেখা গেল তিনের ঘরটাও রপ্ত হয় নি। মুখেই পড়ে যায়, মনে তিলমাত্র আঁচড় কাটে না। কাজেম পণ্ডিতের তখন নূতন বয়স, মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে তিনি বেদম পিটাতেন।

নির্বিকার শম্ভু। এক ফোঁটা চোখের জল পড়ত না। কাজেমের হাত ব্যথা হত শুধু। তিনিও নাছোড়বান্দা—শেষটা আর এক উপায় ধরলেন। শম্ভুর মাথা বাঁ-হাতে নিচু করে ধরে গোড়ালি দিয়ে পিঠে মারতেন। ফল ইতরবিশেষ হল না পণ্ডিতের কষ্টের কিছু লাঘব হওয়া ছাড়া। আরও রোখ চড়ে যেত। একদিন, মনে আছে, পালাক্রমে হাত ও পা দিয়ে পিটোলেন মিনিট কুড়িক ধরে। অবশেষে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে টুলের উপর বসলেন। শম্ভু দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে আছে। কাজেম পণ্ডিত এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

একটু সামলে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ধারাপাত নিয়ে পড়তে বললাম, গ্রাহ্য হল না?

জবাব না পেয়ে পণ্ডিত পুনশ্চ উত্তেজিত হলেন। কাছে গিয়ে শম্ভুর ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে সে গড়িয়ে পড়ল। পাঠশালাসুদ্ধ আমরা ভয় পেয়ে গেছি। মারা গেল নাকি পিটুনি খেয়ে? পণ্ডিতের আবার কবিরাজিও একটু-আধটু জানা আছে। নাড়ি দেখলেন, মুখের দিকেও তীক্ষ্ণ নজরে চাইলেন। তারপর হেসে উঠলেন।

ঘুমিয়ে পড়েছে। ভয় ধরিয়েছিল হতভাগা! শম্ভু নয়—বেটা কুম্ভকর্ণ। ঘুমোতে শিখেছে বটে—মার খেতে খেতেও ঘুম!

বড় হয়ে কলকাতায় কায়েমি বসবাস করি। আগে গ্রামের সঙ্গে তবু যা হোক যোগাযোগ ছিল, বছরে দু-একবার যেতাম—ইদানীং কয়েক বছর তা-ও আর হয়ে উঠছে না। বাবার অসুখ নিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। তারপর তিনি মারা গেলেন। বাবা অতি সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন। কাজকর্মে শহরে থাকতে হলেও গ্রামের সকলের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। তাঁর

আত্মার তৃপ্তি হবে এই রকম মনে করে খড়া-গলায় গ্রামে গেলাম ঐখানে শ্রাদ্ধশান্তির আয়োজন করতে।

শম্ভুর বাড়ি গেলাম। চেনা যায় না, বিরাট দশাসই পুরুষ। জিজ্ঞাসা করলাম, কি খেয়ে এমন দেহটা করলি বল্‌ দিকি? বোকার মতো সে হাসে। গলার আওয়াজও এমন হয়েছে যে কথা শুনলে বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে। তবে কথা বলে অত্যন্ত কম—নিতান্ত যা নইলে ঘর-সংসার করা চলে না। সৎ ও পরিশ্রমী বলে তার সুনাম শুনেছিলাম, বাড়ির চারিদিকে চেয়ে চেয়ে তার পরিচয় পাওয়া গেল। পৈতৃক জমাজমি জঙ্গল হয়ে পড়ে ছিল, সমস্ত কারকিত করে সোনা ফলাচ্ছে সে এখন। খানাখন্দ যা ছিল ভরাট করেছে, ডাঙা জায়গার মাটি কেটে নাবাল করেছে। এক ছটাক কোথাও পতিত নেই। বাড়ির সীমানার মধ্যে পা দিয়ে মন প্রসন্ন হয়ে উঠল, লক্ষ্মীশ্রীতে ঝলমল করছে যেন চারদিক।

চাষবাস ছাড়াও সে ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ করে। বেরুবার উদ্যোগ করছিল, হাতিয়ার-পত্র বের করে জলযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল। বউ এই সময়ে মাঝারি গোছের এক পাকা কাঁঠাল এনে সামনে দিল। শম্ভু বিয়ে করেছে আমাদেরই পাড়ার মেয়ে, নাম ক্ষুদি।

কাঁঠাল রেখে ক্ষুদি এক ঘটি জল আর নারিকেল-মালায় করে একটুখানি তেল এনে রাখল। তেল লাগবে খাওয়ার পর হাত ও ঠোঁট থেকে কাঁঠালের আঠা ছাড়াতে। কাঁঠালটা ভেঙে শম্ভু দুটো-একটা করে সব কোষ খেয়ে ফেলল। আমি হাঁ করে দেখতে লাগলাম। প্রথমটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। বেগ ক্রমে মন্দীভূত হয়ে এল, শেষটা আস্তে আস্তে রস করে খাচ্ছে, সিটে ফেলে দিচ্ছে। তবু ছাড়বে না।

কাজেম পণ্ডিতের সেই কুম্ভকর্ণের উপমা মনে পড়ে গেল। রামায়ণে আছে, কুম্ভকর্ণ জেগে উঠে—'কি খাই, কি খাই—' হুঙ্কার তুলত, ভূরি ভূরি আয়োজন ও অসংখ্য জীবজানোয়ারের প্রয়োজন হত তার জঠরানল নির্বাপণের জন্য। বললাম, পুরো কাঁঠালটা সাপটে দিলি—পেট কামড়াবে না?

শম্ভু বলল, সন্দেশ-রসগোল্লা কোথায় পাব? কে খাওয়াচ্ছে বলো?

আমি খাওয়াব। কতগুলো খেতে পারবি?

খেয়ে দেখেছি নাকি? নারিকেল-নাড়ু খেয়েছি একদিন। তিন কুড়ি খাওয়ার পর চোয়াল ধরে গেল, গিলতে কষ্ট হচ্ছিল। নইলে কত যে খেতে পারতাম, বলতে পারি নে।

বললাম, দেখা যাবে আমার বাড়ি ভোজের দিন পরখ করে। আজকে যা, কাজে বেরুচ্ছিস—আজ আর নয়। কাল থেকে আমার ওখানে লেগে পড়বি। তোদের সাহসেই তো গ্রামে কাজ করতে এলাম।

শম্ভুকে দিয়ে আশাতীত কাজ পেলাম। দিনরাত্রি সে খাটত। এই জিনিস-পত্র বওয়াবয়ি, দু-ক্রোশ দূর থেকে শামিয়ানা ঘাড়ে করে নিয়ে আসা, পুকুরের মাছ-ধরানো, সমস্ত রাত্রি জেগে সেই মাছ কোটা-বাছা ও ভাজার ব্যবস্থা করা, উনুনের ধারে এক আঁটি উলুখড় টেনে নিয়ে তার উপরে বসে ঠায় পাহারা দেওয়া—এক টুকরো মাছ যাতে সরে না যায় কোনক্রমে। যেখানে আটকাচ্ছে, সেইখানে শম্ভু। আমায় থাকতে দিল না, শুতে পাঠাল। বলে, হবিষ্যি করে করে শরীর খারাপ হয়ে গেছে, ওর উপর রাত জাগলে অসুখ করবে। শুয়ে পড়গে তুমি, কিচ্ছু ভাবনা নেই।

ভাবনা নেই, বেশ ভাল ভাবেই জানি। নিজে বসে থাকলে যা হত, তার চেয়ে অনেক বেশি তদারক হবে। এত খায় আর এমন ঘুমকাতুরে মানুষ—কিন্তু তিনটে দিন ও রাত্রি কেটে গেল, ফাঁকমতো হয়তো দু-গ্রাস মুখে দিয়েছে, বসে বসেই হয়তো চোখের পাতা বুঁজে এসেছে দু-পাঁচ মিনিটের জন্য। তারপরেই লাফ দিয়ে উঠেছে।

শম্ভু হেসে বলে, কাজ চুকে-বুকে যাক, এর শোধ তুলব। বড়-ভোজে পেট পুরে খেয়ে বিষ্যুদের হাটবার অবধি ঘুমুব। তখন লাঠি মেরেও তুলতে পারবে না।

অসম্ভব নয়। কুম্ভকর্ণও তো ছ-মাস জেগে থেকে মরণ-ঘুম ঘুমাত বাকি ছ-মাস।

ভোজের দিন শেষ দফায় গ্রামের বিশিষ্টেরা বসেছেন উঠানে সামিয়ানার নিচে। সবাই বসে গেছেন—আমি বললাম, তুমিও বসে যাও শম্ভু।

শম্ভু ইতস্তত করে।

বললাম, সকাল থেকে তো দাঁতে কুটো কাটো নি। এ ছাপ্পা মিটতে ঘোর হয়ে যাবে। আর তরকারিপত্তর কদ্দূর কি থাকে, বলা যাচ্ছে না। তুমি খেয়ে নাও এই সঙ্গে। আমি খেতে বসব, সে সময় তুমি এদিকে থাকলে অনেক সুবিধা হবে।

জোর-জবরদস্তি করে তাকে বসালাম। পাতে লুচি পড়েছে, কেউ কেউ একটু-আধটু ভেঙে গালে দিচ্ছেন। বিষ্টু চক্রবর্তী দেখি হাত গুটিয়ে বসে আছেন।

পাশের লোক জিজ্ঞাসা করে, হল কি চক্কোত্তি মশায় ?

আমি খাব না বাপু। বাপের শ্রাদ্ধ তো নয়—অজাত-কুজাতের সঙ্গে খাইয়ে জাত মারবার ষড়যন্ত্র। ওর কি—আমাদের দফাটি সেরে কলকাতায় চলে যাবে দু-দিন পরে।

বেশ চেঁচিয়েই বললেন তিনি। আমার দলের ছেলেরা ছিল—তারাও পাড়া-গেঁয়ে ছেলে, শিষ্ট-সভ্য নয়। তারা রুখে উঠল, একপাশে একটু বসেছে, মাঝে দু-তিন হাত ফাঁক, এক সামিয়ানার নিচেও নয়—অত ঠুনকো জাত নিয়ে চলে না আজকাল। কসবায় যান তো মামলা করতে, হোটেলে পাতড়া পাতেন, সেখানে কি হয়ে থাকে জিজ্ঞাসা কার ?

আমি ছুটে গিয়ে করজোড়ে বললাম, দেখুন—বাবার বয়সি বলতে আপনি একমাত্র বর্তমান। পিতৃস্থানীয় আপনি, কাকা বলে ডাকি—আমি তো আশা করি, আপনিই অভিভাবক স্বরূপ হয়ে সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলবেন।

বিষ্টু চক্রবর্তী কাকুতি-মিনতি গ্রাহ্য করলেন না, রাগে গরগর করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। আরও দু-একজন উঠল তাঁর দেখাদেখি। আমি হাত জড়িয়ে ধরলাম।

তাদের বচসার ফলে দক্ষযজ্ঞ হতে যায় দেখে ছেলেরা বেকুব হয়ে গেছে।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে ক্ষুদি বলে, বাড়ি এসো—

ক্যাচ-ক্যাচ করিস নে বলছি। বেরো।

না—

সঙ্গে সঙ্গে শম্ভু জলের ঘটি নিক্ষেপ করল তার দিকে। ক্ষুদি সরে গেল, তাই লাগল না।

চলে যা হারামজাদি। উঠি তো আস্ত রাখব না তোকে।

ক্ষুদি কেঁদে পড়ল। আমায় সাক্ষি মেনে বলে, শুনলে ছোটবাবু? কি অন্যায় বলেছি যে দশের মধ্যে ঘটি ফেলে মারল আমায়?

শম্ভু গর্জাচ্ছে, ভুল হয়ে গেছে—শিকল তুলে দিয়ে আসি নি। ফাঁক পেয়েছে কি অমনি বেরিয়ে পড়বে!

ক্ষুদিকেও এক পাশে বসিয়ে খাইয়ে দিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর দু-জনে চলে গেল। অন্ধকার পথ—সঙ্গে একটা হারিকেন দিয়ে দিলাম।

শ্রাদ্ধের কাজকর্ম চুকিয়ে তারপর বিষয়আশয় সম্বন্ধে বিলিব্যবস্থা করবার জন্য সদরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে সাংঘাতিক খবর শুনলাম। গরু-কোরবানি নিয়ে ইতিমধ্যে ছোটখাট এক দাঙ্গা হয়ে গেছে গ্রামে। শম্ভুর মাথায় চোট লেগেছে, সে শয্যাশায়ী। এতেই শেষ নয়—সামাদ শেখ অর্থবান লোক, তার হাত থেকে গরু কেড়ে নিয়ে এসেছে, এ অপমানের সে শোধ তুলবে। ফৌজদারি করতে গেছে, টানা-হেঁচড়া এখন অনেক দূর অবধি চলবে।

আমি দেখতে গেলাম। ক্ষুদি কেঁদে ফেলল।

বিষ্টু চক্কোত্তি করল এটা। সকাল-সন্ধ্যে এসে ফিসফাস করত, তখনই জানি কাণ্ড ঘটাবে একখানা।

ন্যাকড়া দিয়ে মাথা-বাঁধা অবস্থায় শম্ভু মাদুরের উপর নিঃসাড়ে শুয়ে ছিল। সেই অবস্থায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল, এই-ও—

আমি বললাম, সকলের আগে তোমারই বা মাথা বাড়িয়ে দেবার গরজটা কি ছিল শুনি? চক্কোত্তির গায়ে তো কই একটা আঁচড় লাগে নি। এর

উপরে ঐ ফৌজদারির ব্যাপারে যদি পাঁচ-সাতটা দিনও ঘোরাঘুরি করতে হয়, শুধু রোজ-গণ্ডার দিক দিয়েই তোমার কত লোকসান হবে হিসেব কর তো!

চুপ করে থেকে মনে মনে বোধকরি ক্ষতি-লোকসানেরই হিসাব করল শম্ভু। তারপর মৃদু কণ্ঠে অনেকটা যেন নিজের কাছে কৈফিয়তের ভাবে বলল, কি করা যাবে? ভগবতীর হেনস্তা হিঁদু হয়ে চোখের উপর দেখি কি করে?

আমার কথাবার্তায় ক্ষুদি সাহস পেয়েছিল। মুখ ভেংচে শম্ভুর স্বরের অনুকৃতি করে বলল, হিঁদু! পাতের কোল থেকে ঘাড় ধরে তুলে দিল, তাদের সঙ্গে এখন যাচ্ছে হিঁদুগিরি ফলাতে!

রক্ত চক্ষু মেলে শম্ভু ক্ষুদির দিকে তাকাল।

ফোড়ন কাটবি নে বলছি মাগি—

আমি বুঝিয়ে বলি, ওদের শেখপাড়ার মধ্যে ওরা কি করছে না করছে—চোখে দেখবার জন্য দলবল নিয়ে না ঢুকলেই হত! সাহেবেরা এই যে হরদম গরু মারছে সৈন্যদের রসদ জোগাতে, তার কি প্রতিবিধান করতে পারছ?

শম্ভু বলে, শেখপাড়ায় হলে কি হয়—ওরা ঠিক করেছিল, সাঁড়াতলার জমিতে কোরবানি করবে। চক্কোত্তি মশায়ের খাস-জমি ওটা। এই সেদিনও আমাদের ছোঁড়ারা ওর লাগোয়া চাতরার বিলে আউশ বুনে এসেছে। এ হল রেষারেষির ব্যাপার—বুঝতে পারলে না? আমরাই বা কম হলাম কিসে?

বলে সে চোখ বুজে পাশ ফিরে শুল। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছুক নয়।

ক-দিন পরে আবার শম্ভুর বাড়ি গিয়েছি, কানাচ থেকে সামাদ শেখের গলা পেলাম। ফৌজদারি রুজু করে দিয়ে সামাদ ফিরে এসেছে, সেই লোক শম্ভুর দাওয়ায় উঠে কথাবার্তা বলছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। টাকা হয়েছে, তালুক-মুলুক হয়েছে—নিচু গলায় কথা বলার লোক সামাদ শেখ নয়। আর এ নিয়ে রসভঙ্গ করতে ইচ্ছা হল না, ঐখানে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরালাম।

সেদিনকার মতন প্রায় ক্ষুদিরই সেই সুরে সামাদ বলছিল, ভারি আমার হিঁদু রে! ঘরে ঢুকতে দেয়? শেয়াল-কুকুরের চেয়ে ঘেন্না করে, জল ফেলে দেয় যদি দাওয়ার উপর উঠিস। চক্কোত্তি-বাড়ি আ... র মোছলমানের যেটুকু খাতির, তোদের তা-ও নয়।

শম্ভুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, ক্ষুদিকে ডেকে বলছে, কি করিস বউ? চৌকি এনে এখনো বসতে দিলি নে শেখ সাহেবকে?

সামাদ ঔদার্য ভরে বলে, থাকলামই না হয় একটু দাঁড়িয়ে! তাতে কি হয়েছে? শোন মোড়ল, মামলা তো দায়ের করে এলাম। তোমাদের পাড়ার কাউকে জড়াই নি। ভাঁওতায় পড়ে গিয়েছিলে, মনোগত ইচ্ছে কারো ছিল না। কেন হবে? ধরতে গেলে আমাদের সঙ্গেই সম্বন্ধ বেশি তোমাদের—যারা কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বামুনেরা দূর-দূর করে। সাক্ষি দিতে হবে তোমাদের—বুঝলে তো? যেমন যেমন এসে বলেছিল চক্কোত্তি, সে নিজে দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়েছিল—সমস্ত বলবে। চক্কোত্তি-পাড়ার পাঁচ জন আর তাদের চাকর-মাহিন্দার চার—মোট ন-টাকে আসামি করেছি। যা সমস্ত শিখিয়ে দেব, পারবে তো বলে আসতে?

শম্ভু হাঁক দেয়, ওরে বউ, কলকেটায় তামাক ধরিয়ে দিয়ে যা শেখ সাহেবকে।

দেখা না দিয়ে আমি সরে পড়লাম। দেখলে হয়তো লজ্জিত হত। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাজকর্ম মিটিয়ে বেরুতে পারলে যে বাঁচি! এদের এই গেঁয়ো ঘোট একেবারে অসহ্য আমার কাছে।

মামলার দিন পড়েছে। ইতিমধ্যে একদিন বিষ্টু চক্রবর্তীর পদধূলি পড়ল আমার বাড়ি। পড়বে তা অনুমান করেছিলাম। এসে তিনি হাহাকার করে পড়লেন।

গেল, গেল—এ জাতের দফা নিকেশ হয়ে গেল, আর আশা নেই। তুমি আমি হা-হুতাশ করে কি করব? শুনেছ তো মোড়লপাড়ার ওদের কাণ্ড? হিঁদু হয়ে হিঁদুর মুখে চুনকালি দিতে সদরে ছুটছে। তুমি একটু বলে দাও না শম্ভুকে—পাড়ার সবাই ওর কথা শোনে।

আমি ঘাড় নাড়লাম।

আমার কথা যদি শোনেন, মিটমাট করে নিনগে সামাদ শেখের সঙ্গে। অনেক তো হল। দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, অনেক কিছু করবার আছে আমাদের। নিজেদের মধ্যে এই সব মারামারি ছেড়ে দিন এবার।

অনেকবার অনেক রকমে বলে ভরসা না পেয়ে চক্রবর্তী অবশেষে বিরস মুখে উঠে গেলেন।

ইমান আলি ফকিরের ওখানে বার্ষিক মেলা, সেই উপলক্ষে জারিগান হবে। ফকির নিজে ঘুরে ঘুরে ইতর-ভদ্র সকলকে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। গান শোনায় শম্ভুর বড় পুলক। সন্ধ্যা অবধি সে কাজকর্ম করে। পাড়াগাঁয়ের ছুতোরগিরি—শহরের বাবু-ছুতোরের কাজ দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না। এক বিশাল কাঁঠালগাছ বড়-করাত দিয়ে চার ফালি করা আছে, তাই এনে সামনে ফেলে দিল—চৌকাঠ গড়ে দাও মিস্ত্রি। বাইশ ধরে সমস্তটা দিন কুপিয়ে তবে তার এক এক খণ্ড সাইজে এল। কাঠের কুচি এই পর্বতপ্রমাণ হয়েছে, গৃহস্থের দশ-বারো দিন উনুন জ্বালানো চলবে ঐ কাঠে। সারাদিন এমনি কাঠ কুপিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরে শম্ভু। বাড়ির সামনে ডোবা—খেজুরগুড়ির ঘাট, স্নান সেরে আসে সেখান থেকে। তারপর ভাত খেয়ে গান শুনতে বেরিয়ে পড়ে।

কীর্তন যাত্রা জারি টপ—যে রকম গান যত দূরেই হোক সে যাবে। তিন ক্রোশ চার ক্রোশ দূর অবধি চলে যায়। নিতান্ত কোন-কিছুর খবর না পেলে পাশের গ্রামে এক যাত্রার দল করেছে—তাদের আখড়ায় গিয়ে পেরাক্ত শোনে। 'শোনে' বললে ঠিক হয় না—গান শুনবার নাম করে বেরোয় বটে, কিন্তু গিয়েই ঘুমুতে শুরু করে। ঠেস দেবার কিছু না পেলে অমনি খাড়া অবস্থায় ঘুমোয়, সে অভ্যাসও আছে। নাসা-গর্জনও হয় মাঝে মাঝে।

আসর ভাঙবার মুখে কেউ ডেকে জাগিয়ে দেয়, ওরে শম্ভু, ওঠ্—গান তো খুব শুনলি, বাড়ি যা এবার। ঘুম-চোখে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে

শম্ভু বাড়ি গিয়ে ওঠে। দোর খোলবার জন্য ক্ষুদিকে ডাকাডাকি করে কষ্ট দেয় না—তার এক উপায় করেছে। বেরুবার সময় ক্ষুদিকে ঘরে ঢুকিয়ে তালাচাবি দিয়ে যায়। ফিরে এসে তালা খুলে ঢুকে পড়ে।

শম্ভু গেছে ফকির-বাড়ি। আসর থেকে কিছু দূরে এক চারা আমতলা পছন্দ করে সেইখানে গামছা পাতল। গান শুনতে অসুবিধা হবে অত দূর থেকে—কিন্তু বুঝতে পারলাম, নিরালায় আরামে ঘুমোতে পারবে, এইটেই হল ঐ জায়গা পছন্দের কারণ। ডাকিয়ে তাকে আমি কাছে এনে বসালাম। বসেই সে দীর্ঘচ্ছন্দে একবার হাই তুলল। একটা ব্যাপার দেখে অবাক হলাম। অনতিদূরে এক বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বিষ্টু চক্রবর্তী ও সামাদ শেখ। ফকির সাহেব তটস্থ তাঁদের সামনে। মুহুর্মুহু তামাক আসছে। পান কিনে কিনে এনে দিচ্ছে। কি কথাবার্তা বলছেন আর হাসাহাসি করছেন দু-জনে। একবার শম্ভুর দিকে নজর পড়ল। দেখি, ঘুম উবে গেছে, কটমট করে তাকিয়ে আছে সে ওঁদের দিকে।

গান ভাঙলে ফিরে চলছি। শম্ভু আছে সঙ্গে। চলতে চলতে শম্ভু বলল, কানাঘুসো শুনতে পেলাম ছোটবাবু, সামাদ শেখ নাকি নিকারির বাঁধাল চক্কোত্তি মশায়কে বন্দোবস্ত দিচ্ছে। গরিবুল্লা নিকারির 'পরে চক্কোত্তির রাগ, হাটের মধ্যে একবার খালুই থেকে মাছ ঢেলে নিয়েছিল। বাগে পেলে নিকারিদের সে দেখে নেবে। শুনছি, চাঁদাডাঙার জেলেরা এরই মধ্যে হাঁটাহাটি লাগিয়েছে চক্কোত্তির কাছে।

আমি বললাম, বাজে কথা। নিকারি-পাড়ার পীর-পয়গম্বর হল সামাদ শেখ। খাজনা বলে যে যা দেয়, তাই খুশি হয়ে নেয়। এত টান জাত-ভাইয়ের উপর—তাদের যে চক্কোত্তির হাতে তুলে দিচ্ছে, বিশেষ সেদিনের অত কাণ্ডের পর—এ আমার বিশ্বাস হয় না শম্ভু।

খানিকটা পিছনে চক্রবর্তীর গলা পাচ্ছিলাম। ওঁরাও বাড়ি যাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে গেলাম। কাছে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের মিটমাট হয়ে গেছে বুঝি কাকা? বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে।

বিষ্টু চক্রবর্তী বললেন, তুমি বললে কথাটা—ভেবে দেখলাম, তাই উচিত। সামাদ শেখ মামলা তুলে নিয়েছেন। আমিও সাঁড়াতলার ভুঁইটা লেখাপড়া করে দিলাম ওঁকে।

হেসে উঠে বলতে লাগলেন, শেখপাড়াটা গাঁয়ের ভিতরেই একটা পাকিস্তান হল আর কি! ওখানে যাচ্ছে-তাই করুকগে ওরা, তাকিয়ে দেখব না। ভুঁইটুকুর জন্ম যেতে হত, সেটা একেবারে ঘুচিয়ে দিলাম।

তা তো হল! সামাদ শেখ এর পর নিকারিদের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে?

চক্রবর্তী বললেন, তা জানো না, জুম্মাঘর করে দেবেন ঐ সাঁড়াতলার ভুঁইয়ে। সমাজে কত নাম হবে—দু-দশ ঘর হাভাতে নিকারি কি বলল না বলল, তাতে কি আসে যায় সামাদের? সে যাক গে বাবা, সামাদের ব্যাপার সামাদ বুঝবেন—আমায় যা বলেছিলে আমি তো করলাম। স্বাধীন হতে যাচ্ছি, কত কি দায়িত্ব এসে পড়ছে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা করে আর মরব না।

শম্ভু জিজ্ঞাসা করে, আমরা স্বাধীন হচ্ছি চকোত্তি মশায়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কত সুখ হবে দেখিস। কোন কষ্ট থাকবে না।

শম্ভু পরমোৎসাহিত হয়ে উঠল, কথার ভাবে টের পেলাম। সহানুভূতির একটুখানি স্পর্শে গলে গিয়ে আমায় বলতে লাগল, কি কষ্টে যে আছি ছোটবাবু! খাওয়ার চাল জোটানো যায় না, পরবার একটু তেনা নেই। এই এক কাচা পরে চালাচ্ছি আজ আট মাস। সামাদের ছেলে আব্বাস হল কাপড় দেবার কর্তা। ন-মাসে ছ-মাসে যদিই বা দু-দশ জোড়া কাপড় এল, শেখপাড়ায় দিতেই ফুরিয়ে যায়—এ অবধি পৌঁছয় না।

চক্রবর্তী ভরসা দিয়ে বললেন, এবারে সে ভয় নেই রে! দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। ওদের হাতে কিছু থাকছে না আর—

শম্ভু সভয়ে বলে, তুমি কর্তা হচ্ছ বুঝি চকোত্তি মশায়?

আমি হই কি আমাদের নিতাই হয়—সে একই কথা। মোটের উপর পাড়ার মধ্যে থাকবে। ভাইয়ে ভাইয়ে বনিবনাও না হলে বাঁটোয়ারা হয়ে যায়

জানিস তো? তাই হচ্ছে আমাদের। চাটগাঁ-ঢাকায় গিয়ে ওরা মাতব্বরি ফলাক গে—হেঁ হেঁ, এ পাইতক্কে আর নয়।

আর একটি কথা বলল না শম্ভু। এই সময়ে বাঁ-হাতি বাড়ির রাস্তায় সে মোড় নিল। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম, সে ঝিমোতে ঝিমোতে চলেছে।

তারপর সেই পরম দিন এল—১৫ই আগস্ট। যে দিন স্বাধীন হলাম। খুব জাঁকালো উৎসব হবে গ্রামে। সহজ ব্যাপার নয়—মনে করুন, কত রকম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে এই দিনের প্রত্যাশায়। বিষ্টু চক্রবর্তী সমস্ত সাধারণ কাজে মাতব্বরি করেন, এ ব্যাপারেও মোটা চাঁদা দিয়েছেন। খাটছেনও খুব। তাঁর হাত এড়াতে না পেরে ক-দিনের জন্য আমি কলকাতায় গিয়ে মাঝারি গোছের একজন বক্তাকে নিয়ে এসেছি সভাপতিত্ব করবার জন্য। বড়দের কাউকে পাওয়া গেল না—বলতে গেলে লগন-সার অবস্থা তাঁদের, এক একজনকে চারটে পাঁচটা মিটিঙের তাল সামলাতে হবে। এমন দিনে এই ধাপ-ধাড়া-গোবিন্দপুর জায়গায় আসতে যাবেন কেন? যাঁকে নিয়ে এসেছি তিনিও অবশ্য কম যান না। ফাঁসিকাঠে ঝুলতে ঝুলতে বেঁচে গিয়েছিলেন, পুলিস বেদম পিটেছিল। জামা খুললে পিঠের উপর তার চিহ্ন মেলে হয়তো আজও।

কিন্তু সভাক্ষেত্রে গিয়ে দেখি, সামান্য লোক হয়েছে, তার অধিকাংশই নাবালক শিশু। পাঠশালার ছুটি ছিল স্বাধীনতা-লাভের উপলক্ষে। কাজেম পণ্ডিত এখনো আছেন—বয়সের ভারে দেহ বেঁকে গিয়েছে, শনের মতো শাদা চুল-দাড়ি। তা হলেও প্রতাপ অব্যাহত আছে এখনো তাঁর। চক্রবর্তী বলে দিয়েছিলেন, ছেলেদের যথাসময়ে সভায় হাজির করে দেবার দায়িত্ব তাঁর উপর। তদনুযায়ী সব ছেলে ধোপদস্ত কাপড় পরে এসেছে—পাঠশালা পরিদর্শনের জন্য যেদিন ইন্সপেক্টরের শুভাগমন হয় সেদিন যেমন তারা সাফসাফাই হয়ে আসে তেমনি। পাঠশালায় হাজির হয়েছিল সবাই, সেখান থেকে পণ্ডিত তাদের সভাক্ষেত্রে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। জোড়া-কঞ্চির ছাট যথারীতি হাতে আছে—ছাত্রদের মাঝখানেই পণ্ডিত বসেছেন, মাঝে মাঝে যখন

গণ্ডগোল বেশি হচ্ছে, পণ্ডিত মাটির উপর সশব্দে ছাটের বাড়ি মেরে বলছেন, এই—। ছেলেরা সভয় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কাজেম পণ্ডিতের দিকে। এই দুধের ছেলেগুলোর জন্যই কি এমন একজন বক্তাকে নিয়ে এসেছি কলকাতা থেকে? দেখলাম, বক্তাও বিরক্ত হচ্ছেন। অনেকবার শুনেছি এঁর বক্তৃতা; ভাল ভাল কথার ঝঙ্কারে আবেগময় সুরে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান। এই শিশুরা তার এক বর্ণ বুঝবে না।

বিষ্টু চক্রবর্তীকে একান্তে নিয়ে বললাম, মানুষজন জমেছে কই কাকা?

চক্রবর্তী বললেন, এই রকমই হয়ে থাকে। যাত্রোগান-টান হলে মানুষ ভেঙে পড়ত। বক্তৃতা আরম্ভ হলে আরও কিছু হবে।

আমি রাগ করে বললাম, আমায় কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন আপনারা নাকে সর্ষের তেল দিয়ে। ভাল প্রচার হলে নিশ্চয় আসত অনেকে।

চক্রবর্তী বললেন, হাটে হাটে কাড়া দিয়েছি যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হয়েছে। হপ্তা ভোর খবরের কাগজ পড়িয়ে শোনানো হচ্ছে হাটখোলায় বসে। আর কি করতে হবে? পায়ে ধরে বলতে হবে নাকি যে বাপধনেরা সভায় এসো। তা-ও হয়েছে। কাজেম পণ্ডিতকে হুকুম দিয়ে দিয়েছি। শম্ভু মোড়লকে বলেছি, কেউ যেন কাজে না বেরোয়— মোড়লপাড়ার সকলকে জুটিয়ে নিয়ে আসবি। না এলে আমি কি করব বাপু?

বক্তাকে না জানিয়ে আমি ও চক্রবর্তী পাড়ায় বেরুলাম লোক ডাকাডাকি করতে। শম্ভু কতদূর কি করেছে—তার উঠানেই আগে গেলাম।

শম্ভু, ওরে শম্ভু—

অনেক ডাকাডাকির পর ক্ষুদি বেরিয়ে এসে বলল, ঘুমুচ্ছে—

চক্রবর্তী রাগ করে উঠলেন।

ঘুমুচ্ছে কি রে? এমন একটা দিন—আর ঘুমুচ্ছে এখন? বোঝ বাবাজি, তা হলে মানুষ হবে কোত্থেকে? সামাদ শেখেরা এল না, সে না হয়

shook out of their peaceful slumber the quiet little villages all over the country···What Monoj Babu has given us, is a work of fiction—the literary excellence of which is of a very high order. But when history fails, fiction has to step in to bridge the gulf. Episodes which are apparently unconnected have been welded into an integrated whole with masterly skill and the resultant gripping narrative is a brilliant first-rate novel. The author of BHULI NAI to use a clinches has added one more feather to his cap'—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড। দাম দুই টাকা বার আনা।

ভুলি নাই বিংশ সং। আধুনিক কালের সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস। এই বইয়ের চিত্ররূপও অসামান্য সাফল্যলাভ করেছে। দাম দুই টাকা।

ওগো বধূ সুন্দরী ২য় সং। স্নিগ্ধ-মধুর প্রেমের উপন্যাস। আগাগোড়া দুই রঙে ছাপা। বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই। দাম দুই টাকা বারো আনা।

আগষ্ট, ১৯৪২ ২য় সং। আগস্ট-বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় সুবৃহৎ উপন্যাস।

'If the call given by the Congress in Bombay in August 1942 had electrified the nation, the movement or the people's rebellion in which the reactien took shape had fired the imagination of the artists. This is one of those things of beauty which inspired imagination and has since created forthe entertainment and upliftment of men. Monoj Babu has caught the spirit of the August rebellion and has also added to it something of his own. In this volume he has told a few of the human stories which the flame, smoke and blood had engulfed at time and which he has knit together in an integrated whole—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড। দাম চারি টাকা।

জলজঙ্গল সুন্দরবনের দীর্ঘব্যাপ্ত অরণ্য ও অরণ্যচারীদের নিয়ে উপন্যাস। আমাদের কত নিকটে বসতি অথচ কত দূরের মানুষ তারা! বিচিত্র তাদের জীবনরীতি, অনুরাগ ও জিঘাংসা। শীঘ্রই বেরুবে।

শত্রুপক্ষের মেয়ে ২য় সং। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশ। খরস্রোত বসতিবিরল চরের উপর দুর্ধর্ষ মানুষের জীবন-চিত্র। 'Sj. Monoj Bose has a striking manner of reproducing atmosphere—of bringing to the readers' mind the vast alluvial strecthes, the mighty rivers in spate, fearless spirits in the passion for fight and the ways of human heart that beat the same through different ages and times —**অমৃতবাজার পত্রিকা**। দাম সাড়ে তিন টাকা।

যুগান্তর 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের কিশোর-সংস্করণ। রসসমৃদ্ধ অপরূপ পরিবেশ। ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেবার সর্বাংশে উপযোগী। দাম দুই টাকা।

গল্প

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প বাছাই-করা গল্পের সংকলন। একখানি বইয়ের ভিতর দিয়েই মনোজ বসুর সৃষ্টির সমগ্র রূপটি প্রস্ফুটনের চেষ্টা হয়েছে। লেখকের জীবনকথা, ছবি এবং অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের রসসমৃদ্ধ ভূমিকা বইটিকে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। দাম পাঁচ টাকা।

খদ্যোত 'ছোট গল্প বলিতে যাহা বোঝায়, এগুলি ঠিক তাহাই। ছোট এবং গল্প দুইই। প্লটের চমৎকার বিস্ময়। রস চরম ঘনীভূত। দীপ্তি হীরকের, খদ্যোতের মিটিমিটি নহে। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এত ছোট করিয়া গল্প জমাইবার এই বিস্ময়কর কুশলতার প্রতিদ্বন্দ্বী সংখ্যা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ।

গল্পলেখক মনোজ বসুকে বুঝিতে হইলে এ বইখানি অবশ্যপাঠ্য'—**যুগান্তর**। দাম দুই টাকা।

কাচের আকাশ 'গল্প বলায় মনোজবাবুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আলোচ্য পুস্তকের সব গল্পগুলিতে পরিস্ফুট। পড়তে পড়তে মনে হয় কে যেন সামনে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, বড় মিষ্টি। ওস্তাদ বাজিয়ে অনেকে হতে পারেন, কিন্তু 'হাত মিষ্টি' সবার ভাগ্যে হয় না। লিখতে অনেকে পারেন, কিন্তু মনোজবাবুর মত এমন সহজে মনকে ছোঁবার ক্ষমতা বোধ হয় কম লেখকের আছে'—**দেশ**। দাম দুই টাকা।

দুঃখ-নিশার শেষে ৩য় সং। 'বর্তমান গল্পসংগ্রহে মনোজ বসুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল'—**সজনীকান্ত**। 'Will be gratefully remembered as herbinger of a new intellectual order'—**অমৃতবাজার**। দাম দুই টাকা।

উলু ২য় সং। বনমর্মর-যুগে লেখা রহস্যছন্দিত অতুলন অপরূপ কাহিনী-প্রচয়। দাম দুই টাকা চারি আনা।

একদা নিশীথকালে শোভন সচিত্র ৩য় সংস্করণ। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিবান বই। 'হালকা লেখাতেও মনোজ বসুর ক্ষমতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইবেন' —**শনিবারের চিঠি**। দাম দুই টাকা

দেবী কিশোরী সম্প্রতি ২য় সং বেরিয়েছে। নানা গোলযোগে এই বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ দশ বৎসরাধিক কাল ছাপা সম্ভব হয় নি। দাম দুই টাকা।

নরবাঁধ ৩য় সং। 'একালের আরেকজন শক্তিমান কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু—তাঁহার 'মাথুর' নামক বড় গল্পটিতে এই বাল্য-প্রণয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমন বাস্তব অনুযায়ী, তেমনই কাব্য-

রসে সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক ট্রাজেডী এখানে বাস্তব জীবনেই সেই বৈষ্ণব ভাব-সম্মেলনের অপরূপ কমেডিতে পরিণত হইয়াছে। সে যেমন মধুর, তেমনই নির্মল। কোন ভয় নাই, অকল্যাণের অভিশাপ নাই।...বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিয়া রাখিতে চাই যে এ গ্রন্থের ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আর যাহাই লিখুন বা না লিখুন, কেবল ঐ দুইটির জন্য (আরেকটির নাম 'নরবাঁধ') বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবী করিতে পারেন' —**শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বঙ্গদর্শন**। দাম দুই টাকা।

পৃথিবী কাদের? ৩য় সং। নবযুগের বলিষ্ঠতম গল্প। 'It is a departure in the fiction-literature of the Province'—**অমৃতবাজার**। দাম দেড় টাকা।

বনমর্ম্মর ৩য় সং। 'যে retrospect, চিন্তার গভীরত্ব এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের [illegible] পৌছায়, তাহা মনোজ বসুর আছে'—**পরিচয়**। 'পাড়াগাঁয়ের নদী-মাঠ-বনের ছবি প্রবাসী বাঙালিকে homesick করে তুলবে'—**প্রবাসী**। 'সরল অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর জীবনের সহস্র দুর্বলতা অতি-সাধারণ জীবন-যাত্রার অতি তুচ্ছ ঘটনাবলী ও অতি সামান্য অনুভূতিগুলি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে' —**বিচিত্রা**। দাম আড়াই টাকা।

নাটক

রাখিবন্ধন 'নূতন প্রভাত'-স্রষ্টার অগ্নিক্ষরা নবীন নাট্যসৃষ্টি। 'বিদেশী শাসকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার জাতীয় প্রতিরোধের কণ্ঠরুদ্ধ করিবার জন্য দেশীয় তাঁবেদারদের সহায়তায় শাসকগোষ্ঠির বর্বর অত্যাচার এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিঃশব্দ দুঃখবরণ ও মর্মচেরা আত্মদানের কাহিনীকেই মূলত উপজীব্য করিয়া এই নাটকখানি গড়িয়া

উঠিয়াছে। আন্দোলনের গতিপথে উদয়াচলে নব সূর্যোদয়ের যুগান্তকারী ঘটনাকেও এই নাটকে সুকৌশলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাক্তন পদলেহীদের ভোল-পরিবর্তনের উপভোগ্য চিত্রটির অপরূপ বিন্যাস নাটকখানিকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া দিয়াছে। সময়ের ব্যবধানে দুইখানি নাটককে একই নাটকে গ্রথিত করিবার যোগ্যতা অনস্বীকার্য। কুমুদ, সুশীল, আজিজ, উমা, প্রিয়নাথ, ভবদেব, যজ্ঞেশ্বর, টমসন প্রমুখ চেনা মুখগুলি তাজা ফুলের হাসির মতই চোখের উপর ভাসিতে থাকে'—**যুগান্তর**। দাম দেড় টাকা।

বিপর্যয় রঙমহলে অভিনীত। 'কোন নাটকের প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হইবার জন্য যে গুণ থাকা দরকার, আলোচ্য নাটকে তাহার সব কিছুই আছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গতি হইয়াছে দ্রুততর। ডায়ালোগ জোরালো ও স্বচ্ছন্দ-গতি। বিষয়বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে'—**আনন্দবাজার**। 'The drama "Biparyaya' which at fiast appreared as 'Nalinir Mrityu' is highly human and essentially bold. It is no exaggeration to say that it has been wrought from the substance of our life to-day and will live long in the memory of those who go through it'—**অমৃতবাজার**। দাম দুই টাকা।

নূতন প্রভাত ৪র্থ সং। 'এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এই ভাবের সত্যদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাংলায় পড়ি নাই'—**সুনীতি চট্টোপাধ্যায়**। 'মনোজ বাবু যে নূতনত্ব করেছেন, তা গতানুগতিক নাটকীয় প্রথা নয়'—**অহীন্দ্র চৌধুরী**। 'এই ধরণের নাটকেরই আমরা কতকাল ধরে প্রত্যাশা করছি'—**নরেশ মিত্র**। 'আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না—সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে'—**নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী**। দাম দেড় টাকা।

প্লাবন ৩য় সং। নাট্যভারতীতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক। 'নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপিচাতুর্য রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে'—**যুগান্তর**। দাম দেড় টাকা।